অনুবাদ সিরিজ—২৭

রব রয়

লাস্ট ডেজ্ অব্ পম্পেঈ, এ টেল অব্ টু্য সিটিজ, ক্রাইম এ্যাং
পানিশমেণ্ট, ট্রাজেডি অব সেক্সপিয়ার, সেক্সপিয়ারের কমেডি,
অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট, নিকোলাস
নিকোল্‌বি, ম্যান্ ইন্ দি আয়রন মাস্ক প্রভৃতি
অসংখ্য অনুবাদ সাহিত্যের
সম্পাদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

নভেম্বর
১৯৬২

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

রব রয়—

ইংরেজদের সহিত রব রয়ের যুদ্ধ

রব রয়—

"পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাক্‌গ্রেগর নয়, পাশে দাঁড়িয়ে ডায়না।"

লেখক-পরিচিতি
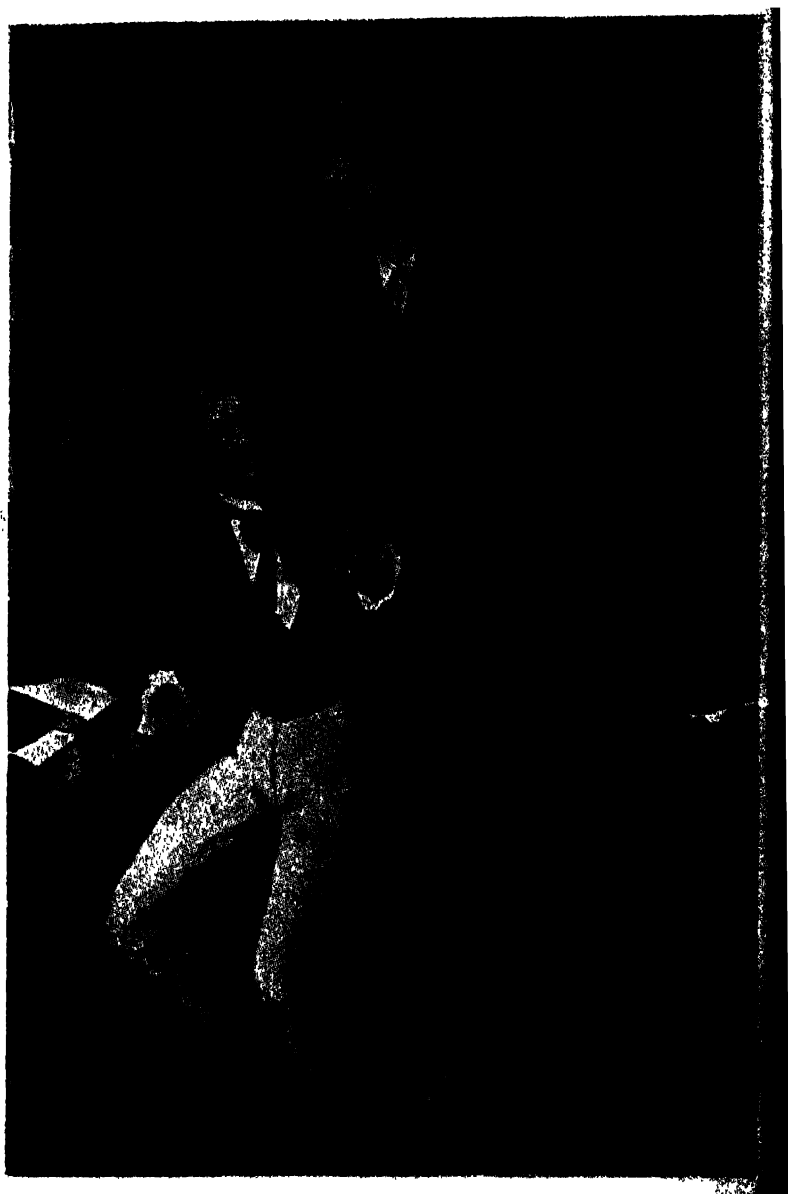
ইংরেজী সাহিত্যের দিক্‌পালগণের মধ্যে সার ওয়ালটার স্কট অন্যতম। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কৈশোরে ও যৌবনে রীতিমত উচ্চশিক্ষাই তিনি লাভ করেছিলেন। দেশের কাব্যসাহিত্যে তখন রোমান্টিক বা কল্পনাপ্রধান রচনার প্রবর্তন করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজপ্রমুখ মহামনীষিগণ। এই রোমান্টিক আবহাওয়া গদ্যসাহিত্যেও প্রবর্তন করার কৃতিত্ব যাঁর, তিনিই ওয়ালটার স্কট।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে কিন্তু কাব্যরচনার দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এদিকেও তখনকার হিসাবে মন্দ সার্থকতা তিনি লাভ করেননি। 'মার্‌মিয়ন', 'লেডি অব দি লেক' প্রভৃতি খণ্ডকাব্য প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল, যেমন হয়েছিল ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কবিতা।

কিন্তু কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর নিজস্ব প্রতিভাকে ঠিকমত বিকশিত করা সম্ভব হচ্ছে না দেখে তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। তারপর থেকে প্রতি বৎসরে একখানি, দু'খানি, এমনকি কখনও বা তিনখানিও সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করে তিনি পাঠকসমাজকে বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। আঠারো বৎসরে বাইশখানি সর্বজন-প্রশংসিত উপন্যাস কোনও লেখক যে লিখতে পারে, এমন ধারণাও এর আগে কেউ করেনি। এই অসাধ্যসাধন স্কটই করেছিলেন। এই বাইশখানির মধ্যে প্রথম উপন্যাসের নাম ছিল 'ওয়েভার্লি'। তাই থেকে এই বাইশখানিকেই সমষ্টিগতভাবে বলা হয় 'ওয়েভার্লি নভেলস্'। 'ব্রাইড অব ল্যামার মুর', 'ওল্ড মর্টালিটি', 'রব রয়', 'আইভ্যানহো', 'কেনিলওয়ার্থ' প্রভৃতি অমর রচনা এই সিরিজেরই অন্তর্গত। 'রব রয়' রচিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সিরিজের শেষ বই যতদিন না প্রকাশিত হয় (১৮৩২), ততদিন এদের লেখক হিসাবে একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন স্কট, যদিও প্রকৃতপক্ষে লেখক যে কে, তা জানতে সুধীসমাজের বাকী ছিল না। প্রত্যেকখানি বইয়ের কাটতি হয়েছিল অসাধারণ, এবং স্কটের অর্থাগমও হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে। অ্যাবট্‌সফোর্ডে সৌধ নির্মাণ করে তিনি সেখানে রাজার হালে বাস করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর ভাগ্যে এল বিপর্যয়। যে প্রকাশকের কাছে তাঁর সমস্ত টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল, তিনি হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেলেন। স্কট সর্বস্ব তো হারালেনই, উপরন্তু প্রায় লক্ষ পাউণ্ডের মত ঋণ রয়ে গেল তাঁর। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল যে স্কটেরও দেউলিয়া খাতায় নাম লেখানো ভালো, কিন্তু স্কট ঘৃণাভরে সে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। ঋণশোধের জন্য পরিণত বয়সে আসুরিক পরিশ্রম করে লিখতে লাগলেন আবার। ঋণও শোধ হল, স্কটও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র একষট্টি বৎসর। অপ্রকাশিত বইও তিনি রেখে গিয়েছিলেন অনেকগুলি। তাঁর দেহাবসানের পর সেগুলি একে একে ছাপা হয়।

ইউরোপের ইতিহাস ছিল স্কটের নখদর্পণে। ইতিহাস বলতে শুধু রাজাগজার কথা নয়, জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-সংস্কৃতি তিনি ভাল রকমই জানতেন। তাই তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের চরিত্রমাত্রই অতিমাত্র বাস্তব। তাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা মর্মের ভিতরে গিয়ে আঘাত দেয় একেবারে। তাঁর সব বইয়ের অসাধারণ জনপ্রিয়তার এইটিই কারণ।

ঐতিহাসিক উপন্যাসেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমাদের দেশের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরই আদর্শে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। স্কটের 'কেনিলওয়ার্থ' উপন্যাসের আখ্যানভাগ বাংলা নাটক 'রিজিয়ার' উপরে যে ছায়াপাত করেছে, একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

এক

ভারী বিপদে পড়েছে বেচারা ফ্রাঙ্ক।

তার বাবা তাকে নিজের ব্যবসায়ে ঢোকাতে চান, সে কিন্তু তাতে নারাজ। প্রাণটা তার কবির প্রাণ, জমাখরচের খাতা সামনে নিয়ে সারাজীবন পাউণ্ড শিলিংয়ের হিসেব করতে হবে, একথা ভাবতে গেলেই সে যেন পাগল হয়ে ওঠে।

বাবা তাকে পাঠিয়েছিলেন ফরাসীদেশে, সেখানকার ব্যবসাবাণিজ্যের হালচাল দেখে আসবার জন্যে। বেশ কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে ফ্রাঙ্ক সবে কাল লণ্ডনে ফিরেছে। যে সব জিনিস শিখবার জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল, সে তার বিশেষ-কিছুই শিখে আসেনি, মগজ বোঝাই করে নিয়ে এসেছে শুধু ফরাসী কবিতার মধুর ঝংকার। কাগজে কাগজে তার বাক্স ভরতি; কিন্তু সে কাগজের কোথাও এক টুকরো বাজার দর টোকা নেই, আগাগোড়া হরেক রকমের কবিতা লেখা।

বাবা অসওয়ালডিস্টোন ঝানু ব্যবসায়ী। জমিদারের ছেলে তিনি, কিন্তু বাপের অবিচারের ফলে তাঁকে এক-কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল কিশোর বয়সেই। অমানুষিক মেহনত আর অসাধারণ বুদ্ধিবলে আজ তিনি লণ্ডনের একজন নামকরা বণিক। পয়সাকড়ি, মান-ইজ্জত—জীবনে মানুষ যা কিছু কামনা করে, আশার অতিরিক্তই তিনি তা লাভ করেছেন। এখন তাঁর একটিমাত্র আশা পূর্ণ হতে বাকী আছে, সেটি এই যে, একমাত্র ছেলে ফ্রানসিসকে গদিতে বসিয়ে দিয়ে এই বিরাট ব্যবসার মালিকানা তার হাতে তুলে দেবেন।

কিন্তু অযোগ্যের হাতে তো ব্যবসা তুলে দেওয়া যায় না!

মালিক যে হবে, তাকে হাতে-কলমে শিখতে হবে জিনিসটা। তার জন্যে পরিশ্রম চাই, নিষ্ঠা চাই, দরদ চাই।

ফ্রাঙ্কের দরদ কবিতার উপরে, কেনাবেচার উপর নয়।

ফরাসীদেশে থাকতেই চিঠিতে সে বাবাকে জানিয়েছিল তার মতিগতির কথা। এখন লণ্ডনে ফিরেই সে স্পষ্ট জবাব দিয়ে বসল— অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির কারবারে সে কোনমতেই ঢুকবে না।

জীবনে যারা নিজের চেষ্টায় বড় হয়, অনেক সময়ই দেখা যায়— বহু সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা দোষও তাদের চরিত্রে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একটা হল এই যে তারা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না। বুড়ো অসওয়ালডিস্টোনও এ দোষের হাত থেকে রেহাই পাননি।

ফ্রাঙ্ক তাঁর অবাধ্য হবে? হয় যদি, দরকার নেই অমন ছেলের। যে ছেলে তাঁর ব্যবসাকে নিজের বলে গ্রহণ করবে না, সে ছেলেকেও তিনি আর নিজের বলে কাছে টেনে রাখবেন না। ত্যাগ করবেন তাকে।

সুতরাং, ফ্রাঙ্ক খুব বিপদেই পড়েছে।

আওয়েন বহুদিনের বিশ্বাসী লোক অসওয়ালডিস্টোনের। অত

বড় কারবারের হিসাবনিকাশ সব তাঁর নখদর্পণে। আওয়েনকে মালিক বিশ্বাস করেন। আওয়েনও মালিকের জন্যে প্রাণ দিতে পারেন। এই আওয়েন যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন পিতাপুত্রের এই মন-কষাকষি মিটিয়ে দেবার জন্যে।

একবার তিনি ফ্রাঙ্ককে বোঝান, আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করেন প্রভুকে। অবশ্য অসওয়ালডিস্টোনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের মত প্রকাশ করবার সাহস আওয়েনেরও নেই, তবু আকারে ইশারায় তিনি মালিককে এইটেই বোঝাতে চাইছেন যে হঠাৎ একটা রাগারাগি করা, হঠাৎ একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া মোটেই উচিত কাজ হবে না। এতে অসওয়ালডিস্টোন নিজে তো দুঃখ পাবেনই, হয়ত তাঁর সাধের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার চেয়ে আপাতত এটা চেপে যাওয়াই ভাল—এই হল আওয়েনের নিবেদন। কিছুদিন চিন্তা করবার সময় পেলে হয়ত ফ্রাঙ্কের মত বদলাতেও পারে। কেনই বা বদলাবে না? ফ্রাঙ্ক তো বোকা নয়! নিজের ভাল কিসে হবে—তা যে পাগলেও বোঝে!

অসওয়ালডিস্টোন একেবারে উড়িয়ে দিলেন না আওয়েনের কথাটা। সময় তিনি দিলেন। কিন্তু মাত্র এক মাসের। এর ভিতর ফ্রাঙ্ককে মন স্থির করতে হবে। হ্যাঁ কি না! বাপের ইচ্ছামত কাজ সে করবে কি না! না যদি করে, এক মাস পরে বাপের সঙ্গে তার আর কোনই সম্পর্ক থাকবে না।

এক মাস সময় দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে ফ্রাঙ্ক আর তার বাবার মধ্যে ও কথা নিয়ে একদিনও আর আলোচনা হয়নি।

কিন্তু আওয়েনের সঙ্গে হয়েছে। আওয়েন একদিন মুখটা কালো করে এসে বলেছেন—মালিক লোক পাঠিয়েছিলেন উত্তর অঞ্চলে। নর্দাম্বারল্যাণ্ডের এক দুর্গম পাহাড়ঘেরা উপত্যকায় অসওয়ালডিস্টোনের পৈতৃক বাড়ি। লোকটা সেই বাড়িতেই গিয়েছিল হয়ত। কী জন্যে গিয়েছিল, তা আওয়েনের জানা নেই। কিন্তু আওয়েনের মন

নানারকম কুডাক ডাকছে। তাঁর সন্দেহ হচ্ছে—এই লোক-চলাচলির ফল ফ্রাঙ্কের পক্ষে শুভ হবে না।

আওয়েনের সন্দেহ খুব অমূলক নয়। ফ্রাঙ্ক যদি চলেই যায়, তবে তার জায়গায় এ কোম্পানিতে বসানো যেতে পারে, এমন একজন লোকের খোঁজ করছেন অসওয়ালডিস্টোন। যেমন তেমন লোক হলে হবে না, 'অসওয়ালডিস্টোন' নামেরই লোক চাই। কারণ ব্যবসাটা চলছে 'অসওয়ালডিস্টোন'-এর নামে। ভবিষ্যৎ পরিচালক অন্য নামের লোক হলে চলবে কেন ?

পৈতৃক বাড়িতে মালিক এখন অসওয়ালডিস্টোনের ছোট ভাই সার হিলডিব্রাণ্ড। তাঁর নাকি অনেকগুলি ছেলে আছে, তাদেরই একজনকে লণ্ডনে নিয়ে এসে কারবারে ভরতি করে নেওয়ার মতলব করেছেন ফ্রাঙ্কের বাপ। সার হিলডিব্রাণ্ড রাজী হয়েছেন, কেনই বা হবেন না ? ছয়টা ছেলে বাড়িতে বসে হৈহৈ করছে, একটা যদি লণ্ডনে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তাতে তো তাঁর ভালই ! গোলমালও কমে, রুটি-গোস্তর খরচাও কমে।

এক মাস কেটে যাওয়ার পর ফ্রাঙ্কের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হল তার বাবার। ফ্রাঙ্ক আগে যা বলেছিল, এবারও তাই বলল—"ব্যবসা-বাণিজ্য আমার ভাল লাগে না, ও আমি পারব না।"

"তুমি তাহলে এখন করবে কী ? আমার কথার অবাধ্য হয়েও কি আমারই অন্নে দিন কাটাতে চাও তুমি ?"

ফ্রাঙ্কের অভিমান হয়, সে বলে—"না, তা চাইনে। তবে যতদিন আমি নিজের পছন্দমত অন্য একটা কাজের যোগ্য হতে না পারছি, ততদিন আমার খরচা চালিয়ে যাওয়া আপনার উচিত—বেশীদিন নয়, কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে মোটামুটি নাম করে নিতে আমার বড় জোর বছর খানেক লাগতে পারে, তার পরই আমি নিজের খরচ নিজে চালাব।"

বুড়ো অসওয়ালডিস্টোন মনে মনে হাসলেন কিনা, বোঝা গেল না। কবিতা লিখে এক বছরের ভিতরই নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে

পারবে, এ আশা যে ফ্রাঙ্কের একান্তই দুরাশা, এটা তাঁর না জানবার কথা নয়। কিন্তু ওদিক দিয়ে আর কথা বাড়াবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। তিনি শুধু বললেন—"বেশ, তাই হবে। কিছুদিন পর্যন্ত কিছু কিছু পয়সা আমি তোমায় দিতে থাকব, তবে খুব হিসেব করে না চললে তাতে তুমি দিন চালাতে পারবে না। এখন তাহলে এক কাজ কর; আমাদের দেশের বাড়িতে অন্য কাউকে আর পাঠাব না, তুমিই যাও। গিয়ে তোমার খুড়তুতো ভাইদের ভিতর র‍্যাশলি বলে যে ছেলেটি আছে, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

"আর আমি? আমি কি সেখানেই থাকব বলতে চান আপনি?"—এ ছাড়া অন্য কোন কথা ফ্রাঙ্কের মুখে জোগায় না।

এতক্ষণে একটু হাসলেন বৃদ্ধ, তবে হাসিটা করুণ। হেসে বললেন—"তাতে তো তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয় বাবা! পাহাড় নদী ঝরনার সে পরিবেশে তোমার কবিতা বেশ স্ফূর্তি পাবে সেখানে। তবে যখন সে জায়গা আর ভাল লাগবে না, নিজের পছন্দমত স্থানে যেতে পার, আমি আপত্তি করব না, এবং কিছুদিন পর্যন্ত তোমায় নিয়মিত অর্থ জুগিয়ে যাব—তোমার দরকার অনুযায়ী।"

এর পর ফ্রাঙ্কের আর বলবার কিছু রইল না। ঘোড়ায় চড়ে রওনা হতে হল উত্তর দেশের পানে। সে যুগে দেশে রেল ছিল না। ঘোড়ার গাড়িতে বা ঘোড়ায় চড়েই যাতায়াত করতে হত সবাইকে। লণ্ডন থেকে দেশের চারিদিকে বড় বড় পাকা রাস্তা ছিল—অবশ্য সে সব রাস্তা এখনও আছে। সেই রাস্তাগুলিতে সারা দিন জলস্রোতের মত মানুষের স্রোত চলত, ব্যবসায়ী, শৌখিন ভ্রমণকারী, সৈন্যদল, পুলিস—কেউ যাচ্ছে, আসছে।

ইংলণ্ডের উত্তর সীমানা পর্যন্ত যে লম্বা রাজপথ রয়েছে, সেই রাস্তা ধরেই ফ্রাঙ্ক এগিয়ে চলল। প্রায় সীমান্ত অবধিই তাকে এই সোজা পথ বেয়ে এগুতে হবে, তারপর, চেভিয়ট পাহাড়ের এ পাশের জংলা অঞ্চলে পৌঁছোবার পরে পাশ কাটিয়ে নেমে যেতে হবে এক

আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তায়, সেই রাস্তারই পাশে এক জায়গায় অসওয়াল-ডিস্টোনদের পৈতৃক বাড়ি।

দিনের পর দিন ফ্রাঙ্ক ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে উত্তর পানে। সকালে উঠে প্রাতরাশ খেয়ে নিয়েই যাত্রা শুরু করে, দুপুরে পথের ধারেই কোন সরাইখানায় কিছু জলযোগ করে নেয়, তারপর সন্ধ্যা হলেই হাতের মাথায় যে সরাই মেলে, সেখানে ঢুকেই ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে দেয়, আর নিজে পেটভরে ডিনার খেয়ে নিয়ে সারারাত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে। মনটা যদি মুষড়ে না থাকত, তাহলে এ অভিযানে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়ার সুযোগ ছিল।

কত লোক! এক একজন এক এক রকম! সৈনিক, সন্ন্যাসী, বণিক, চাষী, এমনকি এমনও সব লোক যাদের দেখলেই ডাকাত বলে সন্দেহ হয়। ডাকাতের সংখ্যা এই উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে সত্যিই বেশী। এরা নিরীহ পথিক সেজে পথচারীদের সঙ্গে মিলে মিশে পথ চলে, তারপরে কোন একটা জঙ্গল পেরবার সময় নিভৃত ঝোপঝাড়ের ভিতর প্রকাশ করে নিজেদের সত্যিকার স্বরূপ। সঙ্গী বণিক বা চাষীর পয়সাকড়ি মালপত্র তো কেড়ে নেয়ই, বাধা পেলে খুনখারাপি করতেও কিছুমাত্র ভয় পায় না। কত লোকের ধন-প্রাণ যে নষ্ট হয় এই রাজপথে এদের হাতে পড়ে, তার হিসাব কেউ রাখে না।

ফ্রাঙ্ক অবশ্য ভয় পায় না ডাকাতকে। তরুণ বয়স, দেহে শক্তি, মনে সাহস—কোনটারই তার অভাব নেই। তার উপর তার সঙ্গে তরোয়াল আছে, এবং পয়সাকড়িও খুব বেশী নেই। শাঁসালো মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাতেরা আক্রমণ করে না; কার কাছে কী আছে, তা যেন আগে থাকতেই মন্ত্রবলে তারা জানতে পেরে যায়। সুতরাং ফ্রাঙ্কের ওদিক থেকে খুব বেশী ভয়ের কারণ নেই।

কিন্তু এমন একজন লোকের সঙ্গে একদিন পরিচয় হল পথ চলতে চলতে, যার এদিক্ দিয়ে ভয়টা যেন বড় বেশী বলে মনে হল। বেঁটে খাটো লোকটি, নাম তার মরিস। রাস্তায় হাজার লোক চলছে,

সবাইয়ের ভিতর থেকে সে যে কেন ফ্রাঙ্ককে বেছে নিয়ে তারই সঙ্গে চলতে আরম্ভ করল, তা সেই জানে। ফ্রাঙ্ক যে হোটেলে খায়, যে হোটেলে রাত কাটায়, মরিসও নির্ঘাত সেইখানে খাবে, সেইখানে রাত কাটাবে। আবার পরদিন নিজের ঘোড়াটি নিয়ে পথে বেরুবে ঠিক ফ্রাঙ্কের পিছনে পিছনেই।

এটা অবশ্য অনুমান করে নেওয়া যেত যে ভদ্র চেহারা দেখে ফ্রাঙ্ককে সৎ লোক বলে ধরে নিয়েছে মরিস, আর পথে ডাকাতের হাতে পড়লে ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে সাহায্য পাবে, এই ভরসায় তার পিছনে এভাবে লেগে আছে। কিন্তু কই! সে তো ফ্রাঙ্ককেও বিশেষ বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না! প্রথমতঃ, ফ্রাঙ্ক তাকে নিজের পরিচয় জানিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে—তাও বলতে কসুর করেনি। কিন্তু মরিস তো নিজের কথা কিছু বলে না! শুধু নিজের নামটা ছাড়া আর কিছু না। কী সে করে, কোথায় সে যাবে, সব প্রশ্নেতেই সে একেবারে নিশ্চুপ। বিশেষ করে তার সঙ্গের পেট-মোটা তোরঙ্গটাতে কী আছে, একথা দৈবাৎ জিজ্ঞাসা করে বসার ফলে, ভয় পেয়ে সে রীতিমত চমকে উঠেছিল, তা ফ্রাঙ্কের নজর এড়ায়নি।

দ্বিতীয়তঃ—রাস্তায় যখন বহু লোকের চলাচল হচ্ছে, তখন মরিস ঠিক ফ্রাঙ্কের পাশটিতে আছে, একেবারে কায়ার পাশে ছায়ার মত। কিন্তু এমন যদি কখনও হল যে রাস্তায় ফ্রাঙ্ক আর মরিস ছাড়া আর কেউ নেই, তা হলেই দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠবে মরিস। ফ্রাঙ্ক যদি চলেছে পথের ডান দিক্ ধরে, সে চট্ করে সরে যাবে বাঁ দিকে, আর কেবলই পিছন পানে ফিরে ফিরে তাকাতে থাকবে—কতক্ষণে অন্য দুই চারজন লোকের মুখ দেখা যায়।

অর্থাৎ, অন্য কারও দিক্ থেকে বিপদ এলে ফ্রাঙ্ক তাকে সাহায্য করবে—এ বিশ্বাস তার আছে; কিন্তু সুযোগ পেলে ফ্রাঙ্কও যে তার উপর রাহাজানি করবে না—এ বিশ্বাস সে করতে পারছে না।

ফ্রাঙ্ক তার মনের ভাব বোঝে, বুঝে বিরক্ত হয়। তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু 'কম্‌লি নেহি ছোড়্তা'। ছিনে

জোঁকের মত লেগে আছে মরিস, কিছুতেই ফ্রাঙ্কের সঙ্গ ছাড়বে না।

চলতে চলতে অবশেষে ফ্রাঙ্ক তার পথের প্রায় শেষ সীমায় এসে গেল। আর একটা দিন, তার পরেই তাকে বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের পথ ধরতে হবে, 'অসওয়ালডিস্টোন হল' আর বেশী দূর নয়।

মরিসকে সে কথা বলতেই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হতাশভাবে বলে উঠল—"বলেন কী! আমার যে এখনও অনেকটা যেতে হবে! আর এই পাহাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা, কী যে হবে!"

যা হবার তা হোক মরিসের, ফ্রাঙ্কের মাথাব্যথা নেই সে জন্যে। ওর ব্যবহারে ফ্রাঙ্ক হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছে।

সেইদিন রাত্রে যখন হোটেলে ডিনার চলছে—

হোটেলের খাওয়ার ঘরে অনেকগুলি লোক একসাথে খেতে বসেছে। এইরকম বসাই রীতি। ফ্রাঙ্ক আর মরিসও আছে খাওয়ার টেবিলে। গল্পগুজব চলছে। অধিকাংশই চাষী বা ছোট দরের ব্যবসায়ী লোক। এদের কাছে সব চেয়ে বেশী মজার গল্প হল ভূতের গল্প। মুখবদলের জন্যে মাঝে মাঝে ডাকাতের গল্পও হয়। আজ সেই ডাকাতের গল্পই চলছে। দুই চারটা ছোটখাট ডাকাতি হয়েও গিয়েছে ইদানীং। এই রাজপথেই হয়েছে। তারই গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলছে একটা লোক। "ওদের হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই কারও। তোমার দুটি পয়সা ট্যাঁকে থাকলে, তাও নিয়ে নেবে। যাবার বেলায় ছোরাখানা তোমার বুকে যদি না বসিয়ে দিয়ে যায়, তবেই জানবে—বাপের পুণ্যি ছিল তোমার।"

"আরে রাখ, রাখ"—বলে হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল স্বয়ং হোটেলের মালিক। একেবারে আচমকা—"দুর্বল ভীতু লোকদের ওপরেই ওদের যত জুলুমবাজি। তেমন তেমন লোকের হাতে পড়লে ডাকাতেরাও আবার ঘোল খেয়ে যায়। শোনোনি ক্যাম্পবেল মশাইয়ের কথা? কী রকম শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন সেদিন?"

"কী? কী? কী? শিক্ষা কী রকম?"—একসঙ্গে অনেক-

গুলো লোক চেঁচিয়ে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হোটেলওয়ালার দিকে।

"গোটা বারো পাহাড়ী ডাকাত চড়াও হয়েছিল ক্যাম্পবেল মশাইয়ের ওপরে। উনি তো গরু-ঘোড়া কেনাবেচার ব্যবসা করেন! অনেক টাকাই ছিল ওঁর সাথে। সঙ্গেও ছিল না কেউ। ঠ্যাঙ্গারেরা খোঁজ রাখে তো! হানা দিল এসে এক নিরিবিলি জায়গায়, এই হোটেলেরই খানিকটা দূরে, এই সড়কেরই তিনটে মোড়ের মাথায়। তা ক্যাম্পবেল সাহেব—"

"কী? কী? কী?"—আবার সমস্বরে চীৎকার টেবিলে-বসা সব কয়টি লোকের—"কী করলেন ক্যাম্পবেল সাহেব?"

"গোবেড়েন করে ছাড়লেন সেই এক ডজন ডাকাতকে, আবার কী করবেন? তারা শেষকালে নাকে খত দিয়ে পালাতে পথ পায় না। কারও হাত কাটা গেছে, কারও পা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, —এই অবস্থাতেই যে যেদিকে পারল, পালিয়ে বাঁচল।"

মরিস হাঁ করে গিলছে অজানা অচেনা এই বীরপুরুষের কীর্তি-কাহিনী। ফ্রাঙ্ক অতিকস্টে হাসি চেপে রেখেছিল এতক্ষণ, এইবার বুঝি আর তা পারে না—এতবড় আজগবি গল্প, বারোটা লোককে কচুকাটা করে ফেললে একটা মাত্র মানুষ—এ কথা শুনেও গম্ভীর হয়ে থাকতে আর যে পারে সে পারুক, ফ্রাঙ্কের সেটা ক্ষমতার বাইরে। আর একটু হলেই সে হোহো করে হেসে উঠেছিল আর কি, এমন সময় সর্বরক্ষে হল হোটেলওয়ালারই একটা চীৎকারে। ভিতরের দিকের দরজার কাছে নতুন একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে দেখেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছে মালিকমশাই—"আরে, একী? আসুন! আসুন! একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল! আসুন মিস্টার ক্যাম্পবেল, আপনারই বীরত্বের কথা আমি এতক্ষণ বলছিলাম আমার অতিথিদের।"

নতুন লোকটি ততক্ষণ এগিয়ে এসে টেবিলের কাছে বসে পড়েছে। একখানা খালি চেয়ার দখল করে নিয়ে বসে পড়ে তিনি বললেন, "আরে দূর, আমার আবার বীরত্ব! গরু-ঘোড়া পিটোনোতেই ওস্তাদ

আমি, হেইহেই করে তাদের লেজ মলতে মলতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, আর হাতের লাঠি যখন তখন তাদের পিঠেই হাঁকাই ; তাকে যদি বীরত্ব বল—”

পরিচারক এসে ততক্ষণে খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিয়েছে ক্যাম্পবেলের সামনে আর তিনি কালবিলম্ব না করে খেতে শুরু করে দিয়েছেন। টেবিলসুদ্ধ লোক তাঁর দিকে যে পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, সে হুঁশই তাঁর নেই যেন।

সত্যিই সবাই তাঁকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। নিজে তিনি কোন বীরত্বের দাবি করেননি, বরং অতি সাধারণ পশুব্যবসায়ী বলেই নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু টেবিলের অতিথিরা তাঁর সব কথাকেই বিনয়বচন মনে করে উড়িয়ে দিয়েছে। হোটেল-ওয়ালা তাঁর সম্বন্ধে যে কথা বলেছে, তাঁর সত্যিকার পরিচয় যে সেই সব কথার মধ্যেই আছে, তিনি যে সত্যিসত্যিই একজন অসাধারণ বীরপুরুষ, এ বিশ্বাস তাদের মনে একেবারে শিকড় গেড়ে বসেছে।

লোকটি দেখতে এমন কিছু বীরের মত নয়, তবে কাঁধটা তাঁর ভয়ানক চওড়া, দেখলেই মনে হয় এ লোকের গায়ের জোর নিশ্চয় প্রচণ্ড। আর একটা দেখবার জিনিস ওঁর চেহারায় আছে। এখন বসে থাকা অবস্থায় সেটা আর ঠিক ঠাহর করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দরজার কাছে যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন অনেকেই লক্ষ্য করেছিল—ভদ্রলোকের হাত দু'খানি আশ্চর্য রকম লম্বা, সোজা হয়ে দাঁড়ালে হাঁটু পর্যন্ত নামে। ঐ হাতে যখন তরোয়াল ঘোরে, তখন শত্রুর অবস্থা তো কাহিল! অত লম্বা হাতের পাল্লা পেরিয়ে ক্যাম্পবেলকে আঘাত করা তো কোন শত্রুর পক্ষেই সম্ভব নয়!

কথা কইল মরিস। গদগদ ভাবে সে বলল, “ধন্য মশাই আপনি। পরিচয় নেই, তবু গা-পড়া হয়ে না বলে পারছিনে যে একা এক হাতে বারোটা ডাকাতকে হটিয়ে দেওয়া সেকালের আর্থার রাজার নাইটেরাও পারত কিনা জানিনে। সেই অসাধ্য সাধন যিনি করেছেন—”

খেতে খেতেই ক্যাম্পবেল বললেন, “সে অসাধ্যসাধন আমি করিনি

মশাই, বিশ্বাস করুন আমার কথা। গল্পটা ভয়ানক অতিরঞ্জিত হয়েছে। বারোটা নয় মশাই মাত্র দুটো লোক। তারাও আবার এমন কিছু তাগড়া জোয়ান নয়। আমার তো মনে হয়েছিল—লোকদুটো দিন সাতেক পেট ভরে খেতে পায়নি, আর আমার উপর চড়াও হয়েছে পেটেরই জ্বালায়। যাই হোক. সে দুটো হাড়গিলের মত মানুষকে মেরে তাড়ানো আপনারাও অনেকেই পারতেন, আমার এমন কিছু বাহাদুরি প্রকাশ পায়নি ওতে।"

ফ্রাঙ্ক লক্ষ্য করে দেখল—টেবিলসুদ্ধ লোকের মুখে অবিশ্বাসের হাসি। ক্যাম্পবেল যে বিনয়বশতঃ নিজের বীরত্বের কথা গোপন, করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই কারও।

হোটেলওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "গল্পটা কতটুকুন অতিরঞ্জিত, তা আমরা সবাই জানি মিস্টার ক্যাম্পবেল। কিন্তু আপনি যখন বলছেন যে ডাকাতের সংখ্যা বারো ছিল না, ছিল মোটে দুই, তখন আমরা মেনে নিচ্ছি সে কথা। দিনকাল ভাল নয়, বীরপুরুষ বলে নাম জাহির হলে মানুষের বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী আজকাল।"

তারপর অতিথিদের সম্বোধন করে বলল, "আমার গল্পটা যে অনেকখানি বাদ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে, তা আশা করি আপনারা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন! যাকে নিয়ে গল্প, তিনি নিজেই বলছেন যে বারোটা নয়, মোটে দুটো ডাকাত—, এমনকি ডাকাতও নাকি তারা নয়, মাত্র দুটো হাড়গিলের মত চেহারার ক্ষুধার্ত ভিখিরী, তাদের তাড়াবার জন্যে তরোয়ালও খুলতে হয়নি, গরু পিটোবার পাচনবাড়ির দু'চার ঘা খেয়েই তারা লেজ তুলে পালিয়েছিল। সুতরাং—"

হোটেলওয়ালাকে আর কিছু বলতে হল না, টেবিলসুদ্ধ লোক অট্টহাসি হেসে উঠল। নিজে ক্যাম্পবেল যাই বলুন, তিনি যে একজন অদ্বিতীয় তরোয়ালবাজ, এতে তাদের তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

খাওয়া-দাওয়া মিটল, এবার যে যার জায়গায় শুতে যাবে। টেবিল ফাঁকা হয়ে গেছে। ক্যাম্পবেল খেতে বসেছিলেন অনেক

পরে, কাজেই খাওয়া তাঁর এখনও শেষ হয়নি। মরিস গিয়ে তাঁর কাছে বসলো—"আপনি কোন্ দিকে যাবেন মশাই? যদি উত্তর দিকে, মানে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত যাওয়া হয় আপনার, চলুন না একসঙ্গে যাই! দিনকাল খারাপ, আপনার মত সাহসী লোকের সঙ্গ পেলে মনে সাহস থাকে।"

ক্যাম্পবেল একেবারে ঝেড়ে ফেললেন তার কথা—"না না, আমি যাব না স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত। আমার গরু ঘোড়া নিয়ে কারবার। এখানে যদি কিছু জন্তু-জানোয়ার কিনতে পারি, তাহলে আবার হয়ত দক্ষিণ দিকেই যাব সেগুলি বেচবার জন্যে। যেদিকেই যাই, দুই একদিন তো এই অঞ্চলেই আছি। আপনার যদি সঙ্গীর দরকার থাকে, তা হলে অন্য সঙ্গী খুঁজুন।"

হতাশভাবে মরিস বললে—"অন্য সঙ্গী তো আছে মশাই একজন।" ইশারা করে ফ্রাঙ্ককে দেখিয়ে দিয়ে বললে—"লণ্ডন থেকে আমার পিছু নিয়েছে মশাই, ঐ সঙ্গীর জন্যেই আমার দুর্ভাবনা। আমার তোরঙ্গটাতে আবার কিছু—বুঝলেন কিনা! কিছু মাল আছে। তা ছোকরা সে খোঁজ পেয়েছে কিনা জানিনে, কিন্তু আমার হয়েছে উভয়সংকট—ওকে ছেড়ে দিয়ে একলা চলতে সাহসও হয় না, আবার ওর উপর বিশ্বসাও করতে পারিনে এতটুকু।"

ক্যাম্পবেল কি একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইলেন মরিসের দিকে? মরিসের তাই মনে হল যেন। কিন্তু বুঝতে পারল না ঠিক; কারণ চকিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই ক্যাম্পবেল চোখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন ফ্রাঙ্কের দিকে। ফ্রাঙ্ক তখন হোটেলওয়ালার কাছে অসওয়ালডিস্টোন হলের রাস্তা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছে!

'অসওয়ালডিস্টোন' কথাটা কানে গেল ক্যাম্পবেলের।

মরিস নিজের শোবার ঘরের দিকে চলে যেতেই ক্যাম্পবেল এসে ফ্রাঙ্কের কাছে দাঁড়ালেন—"অসওয়ালডিস্টোনের জমিদার বাড়িতেই যাচ্ছেন? জমিদার সার হিল্‌ডিব্রাণ্ডের কিছু হন নাকি?"

"তিনি আমার কাকা।" সংক্ষেপে উত্তর দেয় ফ্রাঙ্ক।

"ওঃ !" বলে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার পলকের জন্যে তার দিকে দেখে নিলেন ক্যাম্পবেল। তার পরেই অন্য কথা পাড়লেন—"ঐ যে মিস্টার মরিস—উনি লণ্ডন থেকেই আপনার সঙ্গে আছেন বুঝি ?"

"আমার সঙ্গে কেন থাকবেন ? উনিও পথ চলছেন, আমিও পথ চলছি। পাশাপাশি কখনও কখনও চলি, তার ফলে উনি আমার নামটা জেনেছেন, আমিও ওঁর নামটা জেনেছি। এইমাত্র।"

"ভদ্রলোক বেশ একটু ভীতু মনে হল।" টিপ্পনী কাটেন ক্যাম্পবেল—"আর খুঁতখুঁতেও আছেন একটু।"

"তাই নাকি ?" ফ্র্যাঙ্ক গম্ভীর হয়ে যায়—"আপনি বহুদর্শী লোক। অল্প আলাপেই হয়ত অন্য লোকের চরিত্র বুঝতে পারেন। আমার ও ক্ষমতা নেই।"

ক্যাম্পবেল নাছোড়বান্দা—"শুনলাম উনি স্কটল্যাণ্ড যাবেন।"

"নাকি ? আমাকে সে কথা বলেননি, বলবার কারণও অবশ্য ছিল না।" এই বলে ফ্র্যাঙ্ক বিদায় সম্ভাষণ জানায় ক্যাম্পবেলকে।

ক্যাম্পবেল আবার খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসেন। ঘরে আর কেউ নেই এখন।—অসওয়ালডিস্টোন হল ! র‍্যাশলি অসওয়াল-ডিস্টোন ! এই নবীন যুবক র‍্যাশলির জ্যাঠতুতো ভাই ! আর ঐ মরিস—হতভাগা ভীতু—কী আছে ওর তোরঙ্গে ?

দুই

পরের দিন সকালে।

ফ্রাঙ্ক চলেছে রাজপথ বেয়ে, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে। মরিস পাশেই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ জমাবার প্রবৃত্তি বা সময় কোনটাই তার নেই। সে নিজের চিন্তাতেই মশগুল।

পাহাড়ের রাজ্য ভেদ করে রাস্তা চলেছে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন জঙ্গল। এক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, আর এক পাহাড়ের আড়াল দিয়ে জঙ্গল ফুঁড়ে ফুঁড়ে ডাইনে বাঁয়ে অগুনতি ছোট বড় মাঝারি রাস্তা এঁকে বেঁকে এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে। এই রকমই কোন একটা রাস্তা ধরে তাকে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে হবে। চোখ কান তাই সে সতর্ক রেখেছে। অসওয়ালডিস্টোন হলের পথটা ভুল করে না পিছনে ফেলে যায়। সমুখ দিক্ থেকে যে পথিকই আসুক, তাকে একবার সে থামাবেই, অসওয়ালডিস্টোনের পথ কোন্‌টা—তাকে জিজ্ঞাসা করবেই সে।

অবশেষে একজনের কাছে জানা গেল—এই যে পাশের রাস্তাটাই অসওয়ালডিস্টোন যাওয়ার রাস্তা।

ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে ফ্রাঙ্ক ডেকে বলল—"তা হলে বিদায় মিস্টার মরিস, আপনার তোরঙ্গ নিয়ে সাবধানে পথ চলুন।"

তোরঙ্গ! তোরঙ্গের কথা বলে কেন ছোকরা? মরিস চমকে উঠল। আপদ বিদায় হচ্ছে ভেবে খুশী হবার চেষ্টা করল একবার। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। মনটা যেন মুষড়ে যেতে চায়। বিশ্বাস করবার যোগ্য নয় যদিও ছেলেটা, তবু এতটা দূর তো সঙ্গে এল, কোন বেচাল এযাবৎ দেখা যায়নি ওর। বরং ও সঙ্গে থাকাতে মরিসের একটু সাহসই যেন ছিল। এখন একেবারে নিছক একা। ভাবতেও খারাপ লাগে। চারিদিকে জঙ্গল আর পাহাড়। পথে

লোক নেই তা নয়, কিন্তু তাদের কথাও যেমন বোঝা যায় না, তাদের সাজ-পোশাক দেখেও তেমনি ভরসা পাওয়া যায় না। পাহাড়িয়া বুলি! পাহাড়িয়া ঘাঘরা! কোমরে বেঁটে চওড়া তরোয়াল। ষোল আনা হাইল্যাণ্ডার।

হায়, সেই ক্যাম্পবেল সাহেবের মত একটা লোক যদি সঙ্গে থাকত! মরিস ঘোড়া ছোটায় ভয়ে ভয়ে। এখনও বহুদূর তাকে যেতে হবে। কী জানি কি আছে তার বরাতে!

ফ্রাঙ্ক ততক্ষণ নিজের পথে অনেকদূর এগিয়ে পড়েছে। এবারে আর একটিও সঙ্গী নেই তার। ফ্রাঙ্ক তাতে খুব খুশী। বনভূমির এ আশ্চর্য সৌন্দর্য একা একা অনুভব করবারই জিনিস। সঙ্গী থাকলেই মনোযোগের খানিকটা তার দিকে না গিয়ে পারে না। কিন্তু চারিদিকে যেখানে অফুরন্ত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, সেখানে কি মরিসের মত কোন হাঁদারামের দিকে এক মুহূর্তের জন্যেও ফিরে তাকাতে ভাল লাগে?

পাহাড়ের আওতা ছেড়ে ক্রমে ফ্রাঙ্ক সমতল বনানীর ভিতর এসে পড়েছে। আকাশ ছোঁয়া মহীরুহ, সারির পর সারি। গাছে গাছে যেন অনন্ত মিছিল চলেছে অজানা দেশের পানে। মাথার উপর পাতায় পাতায় নিশ্ছিদ্র ছাদ, কদাচিৎ যদি জোর হাওয়ায় সে পাতা নড়ে উঠল, তবেই আলোর একটা তীর চকিতের ঝলক হেনে মাটিতে এসে পড়বে, পড়েই আবার মিলিয়ে যাবে তক্ষুনি। প্রায়-আঁধার বনের ভিতর নদীর কুলকুল শোনা যায় মাঝে মাঝে, আর শোনা যায় ছুটন্ত কোন ভীরু প্রাণীর পায়ের শব্দ।

হঠাৎ সমুখে খানিকটা খোলা জায়গা, আর তারই ভিতর দিয়ে একপাল শিকারী কুকুরের ঝড়ের বেগে দৌড়।

কারা বুঝি শিকার করতে বেরিয়েছে।

কারা হতে পারে? ফ্রাঙ্ক যেরকম খোঁজখবর পেয়েছে, তাতে অসওয়ালডিস্টোনের জমিদার বাড়ি আর বেশী দূরে হওয়ার কথা নয়। এ সব বনজঙ্গল তাহলে ফ্রাঙ্কের কাকারই সম্পত্তি বোধ হয়। তাহলে

তো এই শিকারীর দল তার কাকারই দল না হয়ে পারে না! তার কাকার বাড়ির কাছে বাইরের লোক কুকুরের পাল নিয়ে শিকার করতে আসবে, এমনটা তো সম্ভব নয়! সেটা যে ভয়ানক বেআইনী হবে!

ফ্রাঙ্কের সব সন্দেহ দূর করে দিয়ে একদল শিকারী তীরবেগে এসে পড়ল ঘোড়া ছুটিয়ে। কয়েকজন লম্বা চওড়া বলবান যুবক, আর একজন প্রায় বুড়ো। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বাবার চেহারার এমন একটা মিল ফ্রাঙ্ক দেখতে পেল যে ইনিই যে তার কাকা, তাতে তার আর একটুও সন্দেহ রইল না। যেরকম হাতিয়ার বাগিয়ে ধরে হৈহৈ করতে করতে শিকারীরা এসে পড়ল, তাতে ঠিক এই সময়ে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে ফ্রাঙ্ক মনে করতে পারল না। কে জানে হয়ত ঝোঁকের মাথায় শেয়ালের বদলে তাকেই শিকার করে বসতে পারে ওরা।

ফ্রাঙ্ক বনের ভিতরই লুকিয়ে রইল, আর তার খুড়ো ও খুড়তুতো ভাইয়েরা "শেয়ালটা গেল কোথায়। শেয়ালটা গেল কোথায়" বলে হাঁকতে হাঁকতে, যেমন ঝড়ের বেগে দেখা দিয়েছিল, তেমনি ঝড়ের বেগেই উধাও হয়ে গেল।

ফ্রাঙ্ক ভাবছে—খুড়োমশাইয়ের বাড়িটা নিশ্চয়ই আর বেশী দূরে নেই, সেইখানে গিয়েই ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করা যাক। ঘোড়া ছুটিয়ে সবে সে বন থেকে বেরিয়েছে, এমন সময় খোলা মাঠটুকুনের ভিতরে দেখা দিল এক মূর্তি।

এ মূর্তিও ঘোড়ার উপরেই সওয়ার বটে, কিন্তু হাতেও তার অস্ত্র নেই, মুখেও তার হৈ-হল্লা নেই। মাঝারি কদমে ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী এদিকে ওদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন বন প্রকৃতির শোভাই নিরীক্ষণ করছে।

ফ্রাঙ্কের উপর তার চোখ পড়তে দেরি হল না। ফ্রাঙ্ক এগিয়ে এসে টুপি খুলে অভিবাদন করল সুন্দরীকে, আর তার অবাক্ চোখের নির্বাক জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বলল—"আমি অসওয়ালডিস্টোন হলে যাব, লণ্ডন থেকে আসছি। রাস্তাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছিনে—"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুন্দরী বলে উঠল—"ওঃ হো হো। আপনি তাহলে মিস্টার ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন? আমার পরিচয় আমি নিজেই দিচ্ছি, ডায়না ভার্নন আমার নাম, আপনার দূর সম্পর্কের বোন। আমি হচ্ছি মিসেস অসওয়াল-ডিস্টোনের, অর্থাৎ আপনার স্বর্গীয়া কাকীমার ভাইঝি।"

এর পর ডায়নার আর শিকারে যাওয়া হল না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে ফ্রাঙ্কের পাশাপাশি চলতে লাগল—অসওয়ালডিস্টোন হলের পথ দেখাবার জন্যে। যেতে যেতেই ফ্রাঙ্কের ব্যাপার অনেক-খানিই সে জেনে নিল, আর ফ্রাঙ্ককে জানিয়ে দিল তার খুড়তুতো ভাইদের ব্যাপারগুলো।

দৈত্যের মত পালোয়ান সাতটা ছেলে ছিল সার হিল্‌ডিব্রাণ্ডের। একটি ভিন্ন আর কোন ছেলে কোনদিন লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায়নি। হৈহৈ, হুটোপাটি, শিকার আর দাঙ্গাবাজি নিয়েই দিন কাটে তাদের। গলা নীচু করে এমন কথাও আভাসে-ইশারায় জানাল ডায়না যে ওদের সব চেয়ে বড় ভাই আর্কির মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয়নি। খুন জখম কী যেন একটা করার দরুন রাজদণ্ডে ফাঁসীই হয়েছে তার।

ফ্রাঙ্কের তো চোখ ছানাবড়া এসব কথা শুনে। এ সে কোথায় এসে পড়ল? অবশ্য, ভাইয়েরা দাঙ্গাবাজ বলে সে যে ভয় পেয়েছে তা নয়, স্বভাব তার শান্তিপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষা করবার মত শক্তি ও সাহস দুটোই তার আছে। কিন্তু এ সংসর্গে বাস করে কি সে শান্তি পাবে? তার বাবা অবশ্য এমন হুকুম দিয়ে দেননি যে এখানে তাকে দীর্ঘদিন থাকতেই হবে। কিন্তু তাঁর মনের যেন সেইরকমই ইচ্ছা ছিল! আর তাছাড়া, ফ্রাঙ্কের নিজেরও তো আগ্রহ রয়েছে—পিতৃপুরুষের আদি স্থানটা ভাল করে দেখে যাওয়ার! এই বিস্তীর্ণ জমিদারি, এই শ্যামল বনভূমি, এই কলস্বনা নির্ঝরিণী, ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা ঐ খাড়া পাহাড়—এ সব তো তার বাবারই হওয়া উচিত ছিল, এবং বাবার সূত্রে তার নিজের! হতে পায়নি শুধু তার ঠাকুরদার

একচোখোমির জন্যে। ছোট ছেলেকে বেশী ভালবাসতেন বলে বেআইনী করে বড় ছেলেকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন।

তা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভালই করেছিলেন। ফ্রাঙ্কের বাবার তাতে ক্ষতির চাইতে লাভই বেশী হয়েছে। ঐ শেয়াল মারা জমিদার হিল্‌ডিব্রাণ্ডের চাইতে তিনি অনেক সুখেই আছেন। সারা ইউরোপের লোক এক ডাকে তাঁকে চেনে। অগাধ অর্থের মালিক তিনি, সে অর্থের পরিমাণের কথা শুনলে হিল্‌ডিব্রাণ্ড আর তাঁর ছেলেরা মূর্ছাই যাবেন হয়ত।

না, সেদিক দিয়ে ফ্রাঙ্কের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু, তবু পৈতৃক বাসভূমির একটা আকর্ষণ আছে বইকি! আর সে বাসভূমি যখন এত সুন্দর! আর সে বাসভূমিতে আসামাত্রই যখন এই অপরূপ সুন্দরী ডায়নার দেখা পাওয়া গিয়েছে। থেকে সে যাবেই কিছুদিন। কিন্তু ঐ খুড়তুতো ভাইগুলো! সাতটার একটা মোটে ফাঁসীতে ঝুলেছে, ছয়টাই এখনও জ্যান্ত আছে। ওদের সঙ্গে মানিয়ে সে ঠিক চলতে পারবে তো?

খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে একজন আছে, যে লেখাপড়াও শিখেছে, দাঙ্গাবাজির ভিতরেও যায় না। সেই একজনই হল র‍্যাশলি, যাকে লণ্ডনে পাঠাবার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির কারবারে যে আসন ফ্রাঙ্কের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, র‍্যাশলি গিয়ে সেই আসনেই বসবে। স্বভাবতঃই ওর সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কের কৌতূহল একটু বেশী। কী রকম লোক সে? ডায়নার কাছে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে চায় ফ্রাঙ্ক। কিন্তু বিশেষ কিছু খবর সে পায় না। অন্য সব বিষয়ে ডায়না সরলভাবেই আলাপ করে, নিজে যেচে নতুন নতুন বিষয়ে আলোচনা শুরু করে, কিন্তু র‍্যাশলির সম্বন্ধে কোন কথা সে যেন বলতেই চায় না।

ফ্রাঙ্ক সন্দেহ করে—কোথায় যেন কী একটা সমস্যা আছে

র‍্যাশলিকে কেন্দ্র করে। এত সামান্য পরিচয়ে সে গোপন কথা ফ্রাঙ্ককে বলতে রাজী নয় ডায়না।

প্রাসাদে পৌঁছোলো যখন ফ্রাঙ্ক আর ডায়না, তখন দু'জনাই দু'জনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

ডায়না নিজে কাব্য ভালবাসে, পড়েও কাব্য। ফ্রাঙ্কও সে চর্চা করে থাকে জেনে সে উৎসাহিত হয়ে উঠল, তক্ষুনি বন্দোবস্ত করে ফেলল যে ফ্রাঙ্ক যতদিন এখানে থাকবে—ফরাসী কাব্য পড়াতে হবে ডায়নাকে।

দুটো দিন বেশ আনন্দে কেটে গেল। খুড়োর সঙ্গে, খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। সার হিল্‌ডিব্রাণ্ড লোক কিছু খারাপ নন, ভাইপোকে বেশ খুশী মনেই স্বাগত জানালেন নিজের বাড়িতে। খুড়তুতো ভাইদের ভিতর এক র‍্যাশলিই একটু গম্ভীর, অসামাজিক। বাকী সবাই হৈ-হুল্লোড় করেই দিন কাটায়। কেউ মদ খেয়ে ভোঁ হয়ে পড়ে থাকে, কেউ খেলে জুয়া, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে খামকাই সারা দেশময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নিজের নিজের খেয়ালে বাধা না পেলে তারা সব সদানন্দ পুরুষ। ফ্রাঙ্ককে বেশ ভালভাবেই তারা নিজেদের ভিতর টেনে নিল। অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে মোটেই তাদের দেরি হল না।

তবে ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ তো ফ্রাঙ্কের নেই। সে জুয়াও খেলে না, অতিরিক্ত মদও খেতে পারে না, আবার ঘোড়া নিয়ে অকারণ ছুটোছুটি করে বেড়ানোও তার ধাতে নেই। কাজেই মিশতে চাইলেও সে মিশতে পারে না ওদের সঙ্গে।

কাজেই ওর সময় কাটে ডায়নার সঙ্গেই।

হয় ডায়নার সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে বসে কাব্য পড়ে, নয়ত ডায়নারই সঙ্গে প্রাসাদের বিস্তীর্ণ হাতার ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িটাও প্রকাণ্ড, তার সংলগ্ন বাগানও তাই। কোথাও ফুল বাগান। কোথাও ফলের বাগান। তা ছাড়াও এমন বিশাল বিশাল নানাজাতীয় গাছ এখানে সেখানে রয়েছে, যা ফুলও দেয় না, ফলও দেয় না। প্রাসাদের

পিছন দিকটা তো এই রকম বড় বড় গাছ থাকার দরুন দিনের বেলাতেও ঝুপসি অন্ধকার, চাকরবাকরেরা পারতপক্ষে সেদিকে যেতেই চায় না।

এই সব জায়গাতেই ডায়না আর ফ্রাঙ্ক বেড়াতে ভালবাসে।

সেদিন বিকালের দিকটায় সার হিল্‌ডিব্রাণ্ডও বাড়িতে নেই, তাঁর ছেলেরাও না। যে র‍্যাশলি প্রায় সময়েই বাড়িতে থাকে, সেও আজ বেরিয়েছে। ডায়না আর ফ্রাঙ্ক যথারীতি বেরিয়ে পড়েছে বাগানে। ঘুরতে ঘুরতে তারা প্রাসাদের হাতার সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ দুটি লোক তাদের সামনে এসে দাঁড়াল ওদিক থেকে। একজনের সাদামাটা পোশাক, আর একজনের পরনে কিন্তু পুলিসের ধড়াচূড়া।

সাদা পোশাকের লোকটি এসে টুপিটা ঈষৎ তুলে সম্মান জানাল ডায়নাকে, তারপর ফ্রাঙ্ককে বলল—"আপনিই লণ্ডন থেকে এসেছেন ? নাম মিস্টার ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন ?"

ডায়না যে এই লোক দুটিকে দেখে খুশী হয়নি, তা বোঝা গেল। ফ্রাঙ্ক কোন কথার জবাব দেওয়ার আগেই সে বলল—"আপনি এখানে, মিস্টার জবসন ?"

তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সে বলল—"ইনি হচ্ছেন জাস্টিস ইঙ্গলউডের কেরানী।"

"কেরানী নই, কেরানী নই, সহকারী" কেরানী বলাতে যেন সম্মানের হানি হয়েছে, এই রকম রুক্ষভাবে জবসন জবাব দিল—"জাস্টিস মশাইদের তো ধরে বেঁধে জাস্টিস করে দেওয়া হয়। তাঁরা তো আইন পড়েনও না, জানেনও না। মান-মর্যাদা আছে, টাকাপয়সা আছে—এই খাতিরেই সরকার তাঁদের হাতে দেশের আইন বজায় রাখবার ভার দিয়েছেন। কিন্তু ভার বইবার লোক তাঁরা নন, নিজেদের আয়েস নিয়েই মশগুল। আমার মত এক একজন সহকারী কাজেই সরকার গছিয়ে দেন তাঁদের পাশে, যারা আইন জানে, আর

আইনভঙ্গকারীদের পাকড়াও করবার মত বুদ্ধি যাদের আছে। কিন্তু এই ভদ্রলোকটিই তো মিস্টার ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন? তাহলে এঁকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

"আসতে হবে? কোথায়? সেকি? কেন?"—বলে উঠল ফ্রাঙ্ক।

"আসতে হবেই। ওয়ারেন্ট যখন বেরিয়েছে" এই বলে পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে সেটা ফ্রাঙ্কের হাতে দিল জবসন,—"ওয়ারেন্ট যখন বেরিয়েছে, তখন আসতে হবেই। নিজের ইচ্ছায় না আসেন—আমার সাথে পুলিস রয়েছে, সে নিয়ে আসবে। তারপর জিজ্ঞাসা করছেন, কোথায় আসতে হবে। আপাতত আসুন জাস্টিস ইঙ্গলউডের বাড়িতে। তাঁর আফিস তো তাঁর বাড়িতেই কিনা! আপাতত সেখানে আসুন, তারপর জামিন যদি না হয়, হওয়ার কথা নয় মোটেই, রাহাজানি, খুনোখুনি, এসব অভিযোগে জামিন দেওয়ার নিষেধ আছে রাজা উইলিয়াম প্রথমের চার নম্বর আইনে—তা হলেই ধরুন, জামিন যদি না হয়—তবে সব চাইতে নিকটের জেলখানা হল গিয়ে—"

ডায়না আর চুপ করে থাকতে পারল না—ধমকে উঠল, "আপনি কাকে কী বলছেন, জানেন? অসওয়ালডিস্টোন হলের মালিকের ভাইপোকে আপনি জেলখানার কথা বলতে সাহস পান?"

অতি নম্র ভাষায় শানিত ব্যঙ্গ ফুটিয়ে জবসন বলল—"অসওয়ালডিস্টোনের মালিকের ছেলেকে তো আমরাই ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলাম ভদ্রে!"

ফ্রাঙ্ক ওয়ারেন্টখানা পড়ে জবসনের হাতে ফিরিয়ে দিল, তারপর দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে ডায়নাকে বলল—"এযে অবাক্ কাণ্ড মিস্ ভারনন! মরিস লোকটার টাকা লুট হয়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত! আর সে হতভাগা নাকি নালিশ করেছে এই বলে যে আমিই আর আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে তার টাকাটা লুটে নিয়েছি! অথচ

আপনারা সবাই জানেন—কাল সন্ধ্যার সময় আমি এই বাড়িতেই ছিলাম, পরশু থেকেই আছি।"

ডায়না মাথা নাড়ল—"নিঃসন্দেহ। শুনছেন জবসন সাহেব! এ নালিশ ডাহা মিথ্যে! ঘটনা যখন ঘটেছে, তখন মিস্টার ফ্রানসিস এই বাড়িতেই ছিলেন।"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে জবসন বলল—"ওসব সাফাই ডাকু-লুটেরাদের সব সময়েই তৈরি করা থাকে। ফ্রানসিস সাহেব যদি আপসে আমার সঙ্গে না আসেন, তা হলে জোর করেই—"

ডায়না ভ্রূকুটি করে বলল—"ঐ একটা কনস্টেবল নিয়ে কতখানি জোর আপনি করতে পারবেন মশাই? তবে জোরাজুরির দরকার নেই, চলুন আমরা যাচ্ছি জাস্টিস ইঙ্গলউডের কাছে। কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব—আপনি তা না বুঝলেও ইঙ্গলউড তা নিশ্চয় বুঝবেন। তাঁকে আমি ভালরকমই জানি।"

ফ্রাঙ্ক সংকুচিত হয়ে বলল—"কিন্তু আপনি কেন—আপনার যে বড্ডই কষ্ট হবে—"

"কষ্ট হবে বলে আপনাকে এই বিপদের মুখে একা ছেড়ে দেব? আমার পিসেমশাই বাড়িতে নেই, আপনি নতুন লোক এদেশে, আমার তো একান্ত কর্তব্যই আপনার সঙ্গে যাওয়া!"

আগে আগে জবসন, তার পিছনে ডায়না ও ফ্রাঙ্ক, সকলের পিছনে কনস্টেবলটি—এইভাবে সবাই জাস্টিস ইঙ্গলউডের বাড়ির দিকে চললেন। যেতে যেতে নীচু গলায় কথা কইতে লাগল ডায়না আর ফ্রাঙ্ক। মরিস কে, কোথায় তার সঙ্গে ফ্রাঙ্কের আলাপ, সবকিছু ডায়না জেনে নিল এই সুযোগে।

সব কথা শেষ হওয়ার আগেই জবসন তার বন্দীকে নিয়ে হাজির হয়ে গেল ইঙ্গলউডের বাড়িতে। বাইরের ঘরটাই জাস্টিস মশাইয়ের অফিস বা আদালত ঘর। ডায়না আর ফ্রাঙ্ক অবাক্ হয়ে দেখল যে সেই ঘরে জাস্টিস ইঙ্গলউডের পাশে বসে যে লোকটি নীচু গলায়

তাঁকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে, সে তাদেরই ভাই র‍্যাশলি ছাড়া আর কেউ নয়।

আশ্চর্য! এদের দেখে ইঙ্গলউড যেভাবে অভ্যর্থনা করলেন, সেভাবে কোনও হাকিম কোনও ফৌজদারী আসামীকে কোনদিন করে না।—"আরে এস এস, ডায়না এস, কতদিন যে তোমাকে দেখিনি! এটি কে? তোমার কুটুম্ব সেই ফ্রানসিস বুঝি? র‍্যাশলি এইমাত্র আমায় এর কথা বলছিল। বাবা ফ্রাঙ্ক, তুমি আমায় চিনবে না—এ তো জানা কথা! কিন্তু তোমার বাবা ও আমি ছেলেবেলায় এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। সে ছিল আমার সব চাইতে প্রিয় বন্ধু। তা সে ভাল আছে তো?"

কী ভাষায় এ রকম সাদর সম্ভাষণের উত্তর বর্তমান অবস্থায় দেওয়া যেতে পারে, ফ্রাঙ্ক বা ডায়না তা তো ঠিক করতেই পারে না! তা না পারুক, কেরানী জবসনের জিভের ডগায় জবাব জুগিয়েই আছে। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "মাননীয় জজ বাহাদুর! আপনার বাল্যবন্ধুর ছেলে হলেও মিস্টার ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন আজ অভ্যর্থনা পাওয়ার দাবি করতে পারেন না আপনার কাছে। কারণ তিনি অভিযুক্ত। আপনারই সই-করা ওয়ারেন্টের বলে তাঁকে বন্দী করে বিচারের জন্যে আনা হয়েছে।"

"বন্দী?" ইঙ্গলউডের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল—"আরে, বলছ কি তুমি জবসন? কী অপরাধে? আর আমার সই-করা ওয়ারেন্টের কথা এ কী বলছ তুমি? আমি কখন সই করলাম এরকম ওয়ারেন্ট?"

"কেন, এই তো দু'ঘণ্টা আগে! এক গাদা কাগজ আমি সই করিয়ে নিয়ে যাইনি আপনাকে দিয়ে? তারই ভিতরে ঐ ওয়ারেন্টটাও ছিল।"

"ঐ ওয়ারেন্টটাও ছিল?" রেগে উঠলেন ইঙ্গলউড—"এক গাদা মামুলী কাগজের ভিতর গুঁজে দিয়ে তুমি কিনা এরকম একটা

সাংঘাতিক কাগজ আমায় দিয়ে সই করিয়ে নিলে ? একবার বলা দরকার মনে করলে না যে— ?"

জজ সাহেবকে কথা শেষ করতে দিল না জবসন। অপরিসীম ধৃষ্টতার সঙ্গে বলে উঠল—"যে এ ওয়ারেণ্টটা আপনার বাল্যবন্ধুর পুত্রের নামে ? বললে কি আপনি সই করতেন না ? তা যদি হয়, তাহলে স্বীকার করি আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। আসলে কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আইনের চোখে বন্ধুর ছেলে শত্রুর ছেলে সবাইয়ের এক মূল্য।"

ইঙ্গলউডকে একান্ত ভালমানুষ পেয়ে জবসন অনেক ক্ষেত্রেই নিজের ইচ্ছামত কাজ করে থাকে, এবং সব সময়ে উপরওয়ালার উপযুক্ত মর্যাদা ইঙ্গলউডকে দেয়ও না। কিন্তু আজ ইঙ্গলউড রীতিমত রেগে উঠলেন—এবং জবসনকে ধমক দিয়ে বললেন, "আইনের গোড়ার কথাটা ভুলে যাওয়া তোমার উচিত নয় জবসন ! সম্ভব অসম্ভব বিবেচনাটা আগে করতে হবে। যে কেউ এসে যে কোন লোকের নামে একটা যা তা অভিযোগ করলেই অমনি পুলিস পাঠিয়ে তাকে ধরে আনতে হবে ? তদন্ত তদারক করতে হবে না ? ওয়ারেণ্ট না বার করে তুমি একটা খবর পাঠাতে পারতে ফ্রাঙ্কের কাছে, আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে !"

এই বলে জবসনের হাত থেকে ওয়ারেণ্টখানা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি পড়ে ফেললেন চট করে, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—"কে এই মরিস ? মজার নালিশই করেছে বটে ! কোটি কোটি টাকার মালিক ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন মরিসের গোটা কতক টাকা কেড়ে নিয়েছে রাহাজানি করে ! বাঃ !"

অপ্রত্যাশিতভাবে র‍্যাশলি কথা কয়ে উঠল এই সময়—"একটু ভুল হল আপনার জাস্টিস ! কোটি কোটি টাকার মালিক ফ্রাঙ্ক নয়, তার বাবা। আর সে টাকার উত্তরাধিকারীও ফ্রাঙ্ক কোনদিন হবে কিনা, ঠিক বলা যায় না।"

ওর কথার শেষ দিক্‌টা কানেই গেল না ইঙ্গলউডের, প্রথম অংশটা

শুনেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"ও একই কথা। বাপের টাকা কি ছেলের নয়? কিন্তু আইনের দিক্ থেকে, হ্যাঁ, আইনের দিক্ থেকে অবশ্য বেশ খানিকটা অসুবিধে দেখা যাচ্ছে। ফ্রাঙ্ক নিজে কোটিপতি হলে ওর নিজের জামিনেই ওকে ছেড়ে দিতে পারা যেত। এক্ষেত্রে তা পারছিনে। তুমি এক কাজ কর র‍্যাশলি। চট করে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি চলে যাও, আর তোমার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তিনি এসে জামিন হয়ে ওকে নিয়ে না গেলে—অর্থাৎ জবসনের অবহেলার জন্যে ওয়ারেণ্ট যখন বেরিয়েই পড়েছে, তখন জামিন তো একটা চাইই!"

র‍্যাশলি কোন কথা না বলে উঠে বেরিয়ে গেল। ডায়না যেন কেমন বাঁকা চোখে তাকাল তার দিকে। সে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না র‍্যাশলির মনের ভাব। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে ফ্রাঙ্কের জামিন হওয়ার জন্যে সে গিয়ে তার বাবাকে সত্যিই অনুরোধ করবে। ফ্রাঙ্কের মুক্তি যদি তার কাম্যই হবে, তবে ওকথা সে যেচে ইঙ্গলউডকে মনে করিয়ে দিতে গেল কেন যে ফ্রাঙ্কের বাবা এখনও বেঁচে আছেন, এবং বাপের টাকা ফ্রাঙ্ক হয়ত নাও পেতে পারে!

ইঙ্গলউড এইবার বললেন—"অভিযুক্তকে তো হাজির করেছ. কিন্তু তোমার বাদী কই? সে-মরিস ব্যক্তিটি কই, যার টাকা চুরি হয়েছে?"

জবসন বিরসমুখে জবাব দিল—"ভদ্রলোক গভর্ণমেণ্টের চাকুরে। মামলার জন্যে এখানে আটক হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি লিখিত অভিযোগ করে নিজের কাজে স্কটল্যাণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বিচারের দিন স্থির করে আপনি তাঁকে জানালেই তিনি এসে হাজির হবেন।"

"দেখি সে দরখাস্ত!" বললেন ইঙ্গলউড।

দরখাস্ত বার করে দিল জবসন। যাতে ফ্রাঙ্ক তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ সেটা শুনতে পায়, এইজন্যেই ইঙ্গলউড জোরে জোরে সেটা

পড়তে শুরু করলেন—"ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন আমার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের গ্রামের দিকে চলে গেল, আমি চলতে থাকলাম সোজা পথ ধরে। সারাদিন কোন ঘটনাই ঘটল না। সন্ধ্যার একটু আগে, একটা ছোট্ট বনের ভিতর দিয়ে যখন চলছি, বনটা পেরিয়ে সরাইখানায় পৌঁছবার জন্যে বেশ তাড়াতাড়িই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি, তখন হঠাৎ পাশ থেকে ছুটে এসে একটা ঘোড়া আমার পথ আটকে দাঁড়াল। তার আরোহী তরোয়াল বাগিয়ে ধরল আমার গলা লক্ষ্য করে। আমি চারিদিকে তাকিয়ে অত বড় রাস্তাটায় একজনও পথিক দেখতে পেলাম না, তবে দেখলাম যে আর একজন লোক ঘোড়া থেকে নেমে ঠিক আমার পিছনটাতে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দস্যু তাকে বলল—"তাড়াতাড়ি কর অসওয়ালডিস্টোন!" আর দ্বিতীয় দস্যু বা অসওয়ালডিস্টোন আমার ঘোড়ার পিঠে বাঁধা তোরঙ্গটির বাঁধন ছোরা দিয়ে কেটে ফেলে ওটাকে নিজের ঘোড়ায় তুলল। আমি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রথম দস্যু তরোয়ালের খোঁচা দিল আমার কোটের উপর, আর ধমকে উঠল—"চ্যাঁচালেই জান যাবে।" পরক্ষণেই দুটো দস্যুই আমার তোরঙ্গ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি যদিও অসওয়ালডিস্টোনের মুখ দেখিনি, কারণ টুপি মুখের উপর নামিয়ে দিয়ে সে আত্মগোপন করেছিল, তাছাড়া সন্ধ্যার ঠিক আগে বনের ভিতরটাও ছিল অন্ধকার; তবু আমি হলফ করে বলতে পারি যে উক্ত অসওয়ালডিস্টোন মিস্টার ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন ছাড়া আর কেউ নয়। ঐ তোরঙ্গে যে অনেক অর্থ ছিল, সরকারী অর্থ, তা কয়েকদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করার ফলে ফ্রানসিস নিশ্চয়ই জেনেছিল এবং বিদায় নিয়ে গাঁয়ের পথ ধরবার পরে সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সোজা কোন রাস্তায় ঘুরে এসে সন্ধ্যার সময় আমার অপেক্ষা করছিল ঐ বনের ভিতর। পথে কোন একটা ডাকাতকে সে সঙ্গীরূপে জুটিয়ে নিয়েছিল, কে না জানে যে এ অঞ্চলে ডাকাতের ছড়াছড়ি?"

তার পরেও অভিযোগপত্রে আরও অনেক কিছু লেখা ছিল, সে সব ইঙ্গলউড আর পড়লেন না। দরখাস্তখানা টেবিলের উপর ফেলে

দিয়ে রাগতভাবে জবসনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই, একটা উটকো লোকের নালিশের উপর নির্ভর করে তুমি একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের ছেলেকে ওয়ারেণ্ট করে ধরে নিয়ে এলে ?"

ধমকে খেতে জবসন অভ্যস্ত নয়। আজ বার বার ধমক খেয়ে সে আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না, সেও ক্রুদ্ধ ভাবে সমান পর্দায় জবাব দিল—"সাক্ষী প্রমাণ আছে কি নেই, তা বোঝা যাবে বিচারের সময়। তবে আমি যে জমিদারের ছেলেকে ধরে এনেছি, তা সেই উটকো লোকটার কথার উপরে নির্ভর করেই নয়, অন্য একজনের কথার উপরে নির্ভর করে এবং সেও জমিদারের ছেলে।"

ইঙ্গলউড এর জবাব দেওয়ার আগেই ডায়না বলে উঠল—"সেও জমিদারের ছেলে ? জমিদারের যে ছেলেটি এই একটু আগেই এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার কথাই বলছেন না কি আপনি ?"

জবসন মাথা নীচু করল। লজ্জা পেয়ে নীচু করল, তা নয়। বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে, আর একটি কথাও কইবে না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেই সে মাথা নীচু করল।

ডায়নার কথা শুনে ইঙ্গলউড ওদিকে চমকে উঠেছেন এবং যে পথ দিয়ে র‍্যাশলি অদৃশ্য হয়েছে একটু আগে সেই পথের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। ভাবনাটা আনন্দের নয় নিশ্চয়ই, কারণ ভদ্রলোকের ভ্রূ গিয়েছে কুঁচকে, উপর পাটির দাঁত এসে চেপে বসেছে নীচের ঠোঁটের উপরে।

একটুখানি ঐ ভাবেই তিনি তাকিয়ে রইলেন, তার পরে জবসনকে লক্ষ্য করে বললেন—"সার হিল্‌ডিব্রাণ্ড না আসা পর্যন্ত এ মামলার সম্বন্ধে তো করবার কিছু নেই। ওদিকে তোমার হাতে আরও সব জরুরী কাজ আছে তো ? সেগুলো ততক্ষণ সেরে এস গিয়ে।"

যদিও এই রকম সঙ্গিন সময়ে আদালত ছেড়ে বাইরে যাওয়া জবসনের পছন্দ নয়, তবু জজ সাহেবের হুকুম যখন, অমান্যও তো করতে পারে না ! বিষণ্ণ হয়েই সে বেরিয়ে গেল তার কনস্টেবলটিকে সঙ্গে নিয়ে।

এইবার ইঙ্গলউড সহজভাবে কথা কইতে লাগলেন—"জানো ডায়না, র‍্যাশলি এসে আগেভাগে এতক্ষণ আমায় কী বলছিল? তার জাঠতুতো ভাই ফ্রাঙ্ক এসেছে বাপের ত্যাজ্যপুত্তুর হয়ে, ছোকরা নাকি লোক মোটেই ভাল নয়, বদলোকের সঙ্গে মিশে নিজেও খারাপ হয়ে গিয়েছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আরও হয়ত অনেক কথাই বলত, কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা এসে পড়লে।"

ডায়নার মুখখানা লাল হয়ে উঠল রাগে। আর ফ্রাঙ্ক—সে তো একেবারে হতভম্ব। কী কারণে তার নিজের খুড়তুতো ভাই তার নামে এই সব মিথ্যা কথা রটাতে গেল, তা সে কিছুই বুঝতে পারল না।

ইঙ্গলউডই বলতে থাকলেন—"ফ্রানসিসকে বিপদে ফেলবার জন্যে একটা চক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পারছি। আর সেই চক্রান্তের পাণ্ডা না হোক, একজন অংশীদার যে র‍্যাশলি নিজেই, এতেও বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্রাঙ্ক, সত্যিসত্যিই মরিসের এই ব্যাপারটা যখন ঘটেছিল, তখন তুমি অসওয়ালডিস্টোনে পৌঁছে গিয়েছিলে তো?"

"তার কয়েক ঘণ্টা আগেই। আমি তার সাক্ষী।"—জোর গলায় বলে উঠল ডায়না।

"তাহলে ফ্রানসিসের নির্দোষিতা প্রমাণ করা একটুও শক্ত হবে না। মুশকিল হয়েছে এই যে মরিসকে একবার তলব করে না এনে আমি মুক্তি দিতে পারি না ফ্রানসিসকে।"

"আমার কথাতেও না?" অকস্মাৎ প্রশ্নটা শোনা গেল আদালত ঘরের ভিতরের দিক্ থেকে।

সবাই চমকে ফিরে তাকাল। এঘর থেকে ভিতর বাড়িতে যাওয়ার একটা দরজা আছে। সে দরজা এখন খোলা, এবং সেই দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটি, তাকে দেখেই ফ্রাঙ্ক চেঁচিয়ে উঠল—"মিস্টার ক্যাম্পবেল!"

দরজা থেকে এক পাও না এগিয়ে ক্যাম্পবেল বললেন—"হ্যাঁ, মিস্টার অসওয়ালডিস্টোন, আমি সেই ক্যাম্পবেলই বটে, যার সঙ্গে

আপনার এবং মিস্টার মরিসের সে রাত্রে সরাইখানায় আলাপ হয়েছিল। তারপর কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। মরিস সাহেবের টাকা লুট হয়েছে, এবং আপনি বন্দী হয়েছেন লুণ্ঠনের অভিযোগে। র‍্যাশলির মুখে খবরটা পেয়েই আমাকে ছুটে আসতে হল। কারণ, যদিও আপনার সঙ্গে আমার সামান্যই আলাপ, তবু জেনে শুনে নিরপরাধ লোককে বিপন্ন হতে দিতে পারিনে।"

"নিরপরাধ ?" একটা উল্লাসের চীৎকার বেরুলো একই সঙ্গে ডায়না আর ইঙ্গলউডের মুখ থেকে।

"নিশ্চয় নিরপরাধ।" জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন ক্যাম্পবেল—"আমি ক্যাথলিক, জননী মেরীর নামে শপথ করে বলতে পারি যে মিস্টার ফ্রানসিস অসওয়ালডিস্টোন মরিসের টাকা লুটের সময় ঘটনাস্থলের ধারে কাছেও ছিলেন না।"

"কী করে ? কী করে আপনি জানলেন ? অতবড় শপথ কিসের উপর নির্ভর করে আপনি করতে পারেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন ইঙ্গলউড।

"কী করে জানলাম ? কিসের উপর নির্ভর করে শপথ করতে পারি ?" একটা মৃদু হাসির ঝলক ক্যাম্পবেলের মুখে।

"নিশ্চয় ! ঐটে জানলেই আমি বুঝতে পারি—ফ্রাঙ্ককে এখনই মুক্তি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা।"

"তবে তা জানুন। জানুন যে লুট ফ্রাঙ্ক করেনি, করেছি আমি নিজে।"

"কী ?" বৃদ্ধ ইঙ্গলউড চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

একটা খাটো বন্দুক আঙ্গরাখার ভিতর থেকে চট করে বার করে ফেললেন ক্যাম্পবেল—"এক পাও এগুবেন না। আমি নির্দোষীকে মুক্ত করতেই এসেছি। নিজে ধরা দিতে আসিনি। ফ্রাঙ্ক মশাইকে ছেড়ে দিন। মামলা বাতিল করে দিন। যদি তা না পারেন, বিচার যদি করতেই চান, বিচারের দিন আমায় আবার নিশ্চয় দেখতে পাবেন।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্যাম্পবেল দরজা থেকে অদৃশ্য হলেন। তাঁর শেষ কথাগুলি শোনা গেল তিনি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পরে।

ইঙ্গলউড ডাকাডাকি শুরু করলেন চাকরদের—"প্যাট্রিস! ডিকি! অ্যান্ড্রু!" নিজে উঠে গিয়ে পলাতকের সন্ধান করা নিরাপদ মনে করলেন না।

চাকরেরা এল—খানিকটা বাদে। এসেই তারা জনে জনে বলল—কোন বাইরের লোককে তারা ভিতর বাড়িতে দেখেনি। আর ভিতর বাড়িতে বাইরের লোক ঢুকবেই বা কেমন করে? তারা অবশ্য প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু একটা জলজ্যান্ত মানুষ ভিতরে ঢুকলে কেউ না কেউ কি তাকে দেখতে পেত না?

তাদের বিদায় দিয়ে ইঙ্গলউড বললেন—"বোঝা গেল যে এই চাকরগুলো সবাই ডাকাত। হয়ত ক্যাম্পবেলই ওদের দলের সর্দার। কিন্তু কে এই ক্যাম্পবেল?"

হঠাৎ ডায়নার দিকে তাকিয়ে জাস্টিস ঠাট্টার সুরে বলে উঠলেন—"তুমি হয়ত চিনতে পার ওকে।"

"আমি?" ডায়না যেন ভয়ানক চমকে উঠল।

"ক্যাথলিকে ক্যাথলিকে থুল-পরিমাণ! তুমি আর ক্যাম্পবেল যে এক গোত্রের লোক!"

ফ্র্যাঙ্ক এতক্ষণে কথা কইল—"মিস্টার ক্যাম্পবেল যে ডাকাত, এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করি? সেদিন সরাইখানায় সবাই বলছিল, আর উনি নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে দু'জন ডাকাতের সঙ্গে কয়েকদিন আগেই ওঁর লড়াই হয়ে গিয়েছিল একটা।"

"চালাক চোরেরা অন্যের বাড়ি সিঁধ কাটবার আগে নিজের বাড়িতে কাটে, তা জানো? ডাকাতের সঙ্গে লড়াইয়ের কথাটা রটিয়েই তো ও মরিসের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিল! তবে সে থাকুক, ডাকাত হলেও ক্যাম্পবেল লোক ভাল, কী বল ডায়না?"

বিব্রত ভাবে ডায়না বলল—"আমি কী বলব?"

"মানে, দরকার হলে ও বিচারের দিনেও হাজির হবে—এ বিশ্বাস আমরা হয়ত করতে পারি। সেই ভরসায় ফ্রাঙ্ককে আমি মুক্তিই দিচ্ছি, এবং ক্যাম্পবেলের নামে বার করছি ওয়ারেণ্ট।"—এই বলে খচখচ করে দু'খানা কাগজে দুটো হুকুম লিখে ফেললেন ইঙ্গলউড।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফ্রাঙ্ক বিদায় নিল। বিদায় নিল ডায়নাও। কিন্তু ডায়নাকে একটু ধরে রাখলেন ইঙ্গলউড। মিষ্টি করে তাকে বললেন—"তোমাকে আমি এতটুকু থেকে জানি ডায়না, স্নেহ করি মেয়ের মত। একটা উপদেশ দিই সেই জন্যে। দিনকাল বড় খারাপ। নির্বাসিত রাজা জেমস নাকি ফ্রান্সে বসে বসেই এদেশ আক্রমণের স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ক্যাথলিক, তুমিও ক্যাথলিক, ঐ ক্যাম্পবেল, সে-ও ক্যাথলিক। এ তিনের ভিতর কোন যোগাযোগ না থাকতেও পারে। না থাকাই সম্ভব। আমি অন্ততঃ কায়মনোবাক্যে কামনা করি, সে রকম কোন যোগাযোগ যেন না থাকে। কিন্তু তুমি সতর্ক থেকো, এই আমার অনুরোধ। আমাদের এ অঞ্চলের ক্যাথলিক পাদরি ভগান সাহেবকে তুমি ভালভাবেই জান নিশ্চয় ?"

ডায়না যে খুবই বিচলিত হয়েছে, তা বেশ বোঝা গেল।

ইঙ্গলউড বলে যাচ্ছেন—"ভগানই রাজা জেমসের প্রতিনিধি এদেশে, লোকে এই রকম বলে। সেই ভগানের গতিবিধি আছে অসওয়ালডিস্টোন হলে। তোমার পিসে হিল্‌ডিব্রাণ্ড, আর ছয়টি পিসতুত ভাই সবাই ক্যাথলিক, সবাই জেমসের অনুরাগী। তুমিও তাই কিনা, তা জিজ্ঞাসা করব না। শুধু তোমায় বলব যে আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে হাত পুড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। ঐ ক্যাম্পবেল ক্যাথলিক, নিজে মুখেই বলে গেল। ভগানও ক্যাথলিক পাদরি। কাজেই ক্যাম্পবেল যে ভগানের দলের লোক, এটা ধরে নেওয়া যায়। এবং ক্যাম্পবেল যদি ডাকাতি করেই থাকে, লুঠের টাকা তাহলে ভগানের সিন্দুকেই জমা হয়েছে, এটা অনুমান করাও

কিছু শক্ত নয়। সেই ভগানের যখন গতিবিধি আছে অসওয়াল-ডিস্টোন হলে, তখন তোমার সাবধান থাকার দরকার আছে, এটা বুঝতে পারছ তো? আমি তোমাদের হিতৈষী, কিন্তু আমি ক্যাথলিক নই, এবং আমি আইনের চাকর।"

তিন

ফ্রাঙ্ক বেশ একটু সমস্যায় পড়েছে। তার খুড়ো এবং খুড়তুতো ভাইয়েরা সবাই ক্যাথলিক, এটা সে আগেই জানত। কিন্তু তার দরুন কোনও অসোয়াস্তি সে অনুভব করেনি। কেন করবে? যার যেভাবে খুশি ভগবানকে ডাকুক না! ফ্রাঙ্ক আর তার বাবা প্রোটে-স্টাণ্ট বলেই যে ক্যাথলিক আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখা তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে, এমন কি কথা আছে? কঠিন হয়নি, তার প্রমাণ তো চোখের সামনেই রয়েছে। বাবা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ক্যাথলিক ভাইয়ের বাড়িতে, আর লণ্ডনে আহ্বান করেছেন ক্যাথলিক র‍্যাশলিকে।

না, ধর্মের তফাতকে এ যাবৎ কোন গুরুত্ব ফ্রাঙ্ক দেয়নি, কিন্তু এবার বুঝি না দিলে নয়। ধর্ম যদি রাজনীতিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়, তবে তাকে উপেক্ষা করা যায় কেমন করে? ফ্রাঙ্ক আর তার বাবা রাজভক্ত, ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ডের বর্তমান রাজা জর্জের প্রতিই তাদের অনুগত্য। অসওয়ালডিস্টোনের সমস্ত বাসিন্দাই যদি নির্বাসিত রাজা জেমসের অনুরক্ত হয়, তবে তাঁদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক বাস করে কেমন করে? আর র‍্যাশলিই বা লণ্ডনে গিয়ে প্রোটেস্টাণ্ট জেঠার কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতা করে কেমন করে?

র‍্যাশলি কিন্তু লণ্ডনে চলে গেল। ধর্ম বা রাজনীতির পার্থক্যের দরুন কোন অসুবিধা হতে পারে, এমন ধারণাই যেন তার নেই। অন্ততঃ মুখে সে এমন কোনও সন্দেহের কথা কোনদিন প্রকাশ করেনি। ফ্রাঙ্ক অবশ্য খোলাখুলি আলোচনা করবার সুযোগ পায়নি তার সঙ্গে। জাস্টিস ইঙ্গলউডের বাড়িতে সেদিন যে ঘটনা ঘটল, তার পর থেকে র‍্যাশলি এড়িয়েই চলেছে ফ্রাঙ্ক ও ডায়নাকে, দেখা

হলেও বন্ধু ভাবে আলাপ করেনি। এতে আবার র‍্যাশলির সম্বন্ধে সন্দেহ ফ্রাঙ্ক এবং ডায়নার মনে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

যাই হোক, র‍্যাশলি চলে গেল লণ্ডনে। ফ্রাঙ্ক রইল অসওয়াল-ডিস্টোনে। কিন্তু লণ্ডন থেকে চিঠিপত্র ফ্রাঙ্ক পায় না কেন? সে ক্রমাগত চিঠি লিখে যাচ্ছে বাবার কাছে এবং আওয়েনের কাছে। একখানারও উত্তর আসে না। অবশেষে অস্থির হয়ে সে একদিন নিজেই ডাকঘরে গিয়ে হাজির হল! বড় নিকটে নয়। পাকা ষোল মাইল রাস্তা। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এই ষোল মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যথেষ্ট কষ্ট হল ফ্রাঙ্কের।

কিন্তু কষ্টের কথা আর তার মনে রইল না, যখন পোস্টঅফিসে গিয়েই সে চিঠি পেল একখানা। চিঠি লিখেছেন আওয়েন। শুধু চিঠিই লেখেননি, টাকাও পাঠিয়েছেন কিছু। কিন্তু আশ্চর্য! ফ্রাঙ্ক যেসব চিঠি এযাবৎ লিখেছে লণ্ডনে, তা যে তার বাবার বা আওয়েনের হাতে পৌঁছেছে, এমন কোন স্বীকৃতি আওয়েনের পত্রে তো নেই! তবে কি সে সব চিঠি পৌঁছোয়নি? না পৌঁছোবার কারণ তো একটাই হতে পারে, কেউ মেরে দিয়েছে সেগুলো।

কে মেরে দিতে পারে? র‍্যাশলি? তা ছাড়া আর কে?

র‍্যাশলি আগে থাকতেই রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে ফ্রাঙ্ক তার বাবার ত্যাজ্যপুত্র। শেষ পর্যন্ত সত্যিসত্যিই যাতে তাই হয়, তারই জন্যে বোধ হয় তার এই সব কারসাজি। পৈতৃক কারবার থেকে ফ্রাঙ্ক নিজের ইচ্ছায় সরে এসেছে, তার ফলে সে কারবারে স্থান হয়েছে র‍্যাশলির। এখন পিতার হৃদয় থেকেও যদি ফ্রাঙ্ককে সরানো যায়, তাহলে সে হৃদয়েও র‍্যাশলি কোন্ না স্থান পাবে একদিন! আর সেখানে স্থান পেলেই তো কোটি কোটি টাকার উত্তরাধিকার এসে যাবে র‍্যাশলির হাতে!

র‍্যাশলির সত্যিই দরকার আছে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে তার বাবার যোগাযোগ সব রকমে ছিন্ন করে দেওয়ার। তারই দরুন এ যাবৎ ফ্রাঙ্কের সব চিঠি সে চাপা দিয়েছে।

এবার থেকে তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কারণ র‍্যাশলি তো লণ্ডনে, এখন আর ফ্রাঙ্কের চিঠি সরাবে কে ?

এদিকের চিন্তা কতকটা দূর হল বটে, কিন্তু আর একদিক্ দিয়ে বড়ই অশান্তি ভোগ করতে থাকল বেচারা ফ্রাঙ্ক। সে অশান্তি ডায়নাকে নিয়ে।

ডায়নার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে, এবং ডায়নাকে সে নিজেও করেছে আকর্ষণ। দু'জনের মনের ভাব দু'জনেরই জানা।

স্বাভাবিক অবস্থায় এরকম ক্ষেত্রে বিবাহের প্রস্তাবই ওঠে। তাই ফ্রাঙ্কও হয়ত একদিন সেই প্রস্তাবই করে বসবে বলে অশাঙ্কা হল ডায়নার মনে। যাতে বেচারা অতি আশা করে শেষকালে হতাশার ব্যথা বরণ করতে বাধ্য না হয়, তারই জন্যে একদিন ডায়না নিজের সব কথা খুলে বলল ফ্রাঙ্ককে।

ডায়না শৈশবেই মাতৃহারা। তাই পিসীর কাছেই সে মানুষ হয়েছিল। সেই পিসী ছিলেন সার হিলডিব্রাণ্ডের পত্নী, র‍্যাশলিদের মা। তিনিও মারা গিয়েছেন বছর কয়েক হল। কিন্তু তবু ডায়না হিলডিব্রাণ্ডের বাড়িতেই রয়ে গিয়েছে। কারণ যাওয়ার জায়গা তার আর নেই।

তার বাবা সার ফ্রেডারিক ভ্যারনন নিজেও মস্ত জমিদার। কিন্তু তিনি ক্যাথলিক এবং নির্বাসিত রাজার একজন বড়দরের সমর্থক বলে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাজা জর্জের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এখন তিনি পলাতক। কখনও ফরাসী দেশে যান রাজা জেমসের কাছে, কখনও লুকিয়ে ফিরে আসেন স্কটল্যাণ্ড বা উত্তর ইংলণ্ডে। এদেশে এলে লুকিয়েই তাঁকে থাকতে হয়, কারণ ধরা পড়লেই তাঁর প্রাণদণ্ড নিশ্চিত।

সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে বুঝতে পেরেই আগে থাকতে কিছু কিছু জমিজায়গা সার ফ্রেডারিক সার হিলডিব্রাণ্ডের নামে বেনামী করে ফেলেছিলেন। সেইগুলি এখনও আছে। কিন্তু হিলডিব্রাণ্ডের হাত

থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডায়না যে তা কোনদিন স্বাধীনভাবে ভোগ করবে, এমন আশা নেই। হিলডিব্রাণ্ড পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন।

রাজদ্রোহী ফ্রেডারিকের মেয়েকে আশ্রয় দেওয়ার সময় হিলডিব্রাণ্ড একটা লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছিলেন। তাতে সার ফ্রেডারিক স্বীকার করেছেন যে ডায়না বড় হলে পরে সার হিলডিব্রাণ্ডেরই বংশের কোন ছেলেকে বিয়ে করতে বাধ্য থাকবে। যদি তা সে না করে, তাহলে তাকে মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হতে হবে, অন্য কাউকে বিয়ে করে সংসারী সে হতে পারবে না।

ডায়না সংসারী না হলে তো আর বেনামী সম্পত্তিগুলি সে দখল করতে পারবে না! তাই এরকম চুক্তি।

এখন ডায়না হিলডিব্রাণ্ডের সংসারে মানুষ হয়েও হিলডিব্রাণ্ডের ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেশাখোর উচ্ছৃঙ্খল পিসতুতো ভাইদের সে আদৌ পছন্দ করে না। তাদের কাউকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত তার কাছে বিষবৎ। তাই সে স্থির করেছে—মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনীই সে হবে।

এইজন্য ফ্রাঙ্ককে বিবাহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—স্পষ্ট করেই সে একথা জানিয়ে দিল।

বেচারা ফ্রাঙ্ক! তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল অনুপস্থিত সার ফ্রেডারিকের উপরে। কেমন পিতা এই ভদ্রলোক? নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে মেয়েটির জীবনটা নষ্ট করতে তাঁর একটুও দ্বিধা হল না? কেন এমন জঘন্য চুক্তি করতে গেলেন তিনি? নির্বাসিত রাজা জেমস কি তাঁর কাছে নিজের সন্তানের চেয়েও বড় হল?

কিন্তু এ ধরনের আলোচনা ডায়নার কাছে করবার উপায় নেই। ডায়না তার এই অবিবেচক বাবাকে দেবতার মত ভক্তি করে, তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথাও সে নিজে তো বলেই না, ফ্রাঙ্ককেও বলতে দেয় না।

পরম অশান্তিতে দিন কাটে ফ্রাঙ্কের।

এমনি সময়ে একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল ফ্রাঙ্কের মাথায়। ইদানীং কিছুদিন আবার সে লণ্ডনের চিঠি পাচ্ছিল না। হঠাৎ একখানা চিঠি সে পেল। ডায়নার হাত দিয়েই পেল।

চিঠি লিখেছেন আওয়েন। তিনি দিয়েছেন দারুণ দুঃসংবাদ। ফ্রাঙ্কের বাবা লণ্ডনে নেই। ব্যবসার প্রয়োজনে তাঁকে কিছুদিন আগে হল্যাণ্ডে যেতে হয়েছে। সহসা তাঁর ফিরে আসবারও কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যে এক মহা বিপদ ঘটেছে লণ্ডনেই।

বিপদের মূল সেই র‍্যাশলি।

গ্লাসগো শহর স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ব্যবসার জায়গা। অসওয়ালডিস্টোনদের অনেক রকম কারবার সেখানে, অনেক টাকার লেনদেন হয় সেখানকার বিভিন্ন বণিকের সাথে। কয়েকটা বড় দেনা মেটাবার জন্যে কোম্পানির এক লক্ষ পাউণ্ডের হুণ্ডি নিয়ে র‍্যাশলি বেরিয়ে এসেছে লণ্ডন থেকে, তারপর থেকেই তার আর কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে দেনা মেটাবার নির্দিষ্ট দিন এসে পড়েছে। ঐ তারিখে সব দেনা পরিশোধ না করলে অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানি দেউলিয়া বলে গণ্য হবে। অন্য জায়গায় তাদের কোটি কোটি পাউণ্ডের সম্পত্তি থাকলেও তাতে কিছু এসে যাবে না। নির্দিষ্ট দিনে দেনা শোধ করতে না পারার অর্থই হচ্ছে কারবার খতম হওয়া।

খোদ মালিক লণ্ডনে উপস্থিত থাকলে যে বিপদ এক তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া যেত, সে বিপদ তাঁর অনুপস্থিতির দরুনই, আওয়েনের পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কে অর্থের অভাব নেই, কিন্তু সে অর্থ তুলবে কে? হল্যাণ্ড বাড়ির কাছে নয়। মিস্টার অসওয়ালডিস্টোনকে খবর দেওয়া বহু সময়সাপেক্ষ। এখন উপায় কি?

মনে রাখতে হবে—তখন দেশে রেলগাড়ি হয়নি। সমুদ্রে জাহাজ চলে অতি ধীরে, বাতাস উলটো বইলে তা আবার মোটেই চলে না। টেলিগ্রাফ হয়নি তখন, দূরদেশে ডাকে চিঠি পাঠানো যায় না, পাঠাতে

হয় লোক মারফত। তাই অসওয়ালডিস্টোন হল্যাণ্ডে থাকার দরুন যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, বিংশ শতাব্দীতে তিনি চন্দ্রে বা মঙ্গলে থাকলেও ততখানি অসুবিধা ঘটত না।

যাই হোক, বিপদের স্বরূপ বর্ণনা করবার পরে আওয়েন জানাচ্ছেন যে তিনি নিজে তো র‍্যাশলির সন্ধানে অবিলম্বে গ্লাসগো রওনা হচ্ছেনই, তাছাড়া মিস্টার ফ্রাঙ্কেরও সেখানে যাওয়া দরকার। অতবড় শহর, তেমন সুপরিচিত জায়গাও নয়, সেখানে গিয়ে পলাতক র‍্যাশলিকে খুঁজে বার করা একা আওয়েনের পক্ষে হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। দু'জনে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা সফল হওয়ার আশা বেশী। হুণ্ডিগুলো ভাঙিয়ে নগদ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় র‍্যাশলি যে গ্লাসগোতেই আসবে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ভাঙাবার আগেই হুণ্ডি তার হাত থেকে উদ্ধার করতেই হবে, তা নইলে অসওয়াল-ডিস্টোন কোম্পানির দরজা বন্ধ হওয়া কেউ রুখতে পারবে না।

চিঠি পড়ে ফ্রাঙ্ক ভয়ানক মুষড়ে গেল। তার বিবেক তাকে দংশন করতে লাগল ভয়ানক ভাবে। সে তার বাবাকে ছেড়ে এসেছে বলেই বাবার এই বিপদ। সে চলে না এলে বাবা র‍্যাশলিকে ডেকে পাঠাতেন না, তাহলে র‍্যাশলি এই চুরির সুযোগও পেত না।

এখন তার অমার্জনীয় ভুলের ফলে কোম্পানিটাই দেউলে হতে বসেছে। তার বাবা সারাজীবনের অক্লান্ত শ্রমে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, তা একমুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশে যেতে বসেছে। এ কী মহাপাপ করল ফ্রাঙ্ক ? নিজের আয়েস আর খেয়ালকে চরিতার্থ করবার লোভে কর্তব্যে সে বিমুখ হয়েছে। সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে ?

তার মুষড়ে পড়া ভাবটা দেখে ডায়না বিচলিত হল। এতখানি বিচলিত হওয়ার কারণ কী, তা জিজ্ঞাসা না করে পারল না। আর ফ্রাঙ্কও সব কথা খুলেই বলল ডায়নাকে। ডায়নার সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির অনেক পরিচয় সে পেয়েছে। তাকে যেদিন জবসন

বন্দী করে নিয়ে যায়, সেইদিনই। তার উপর ডায়না তাকে ভালবাসে। সৎপরামর্শ সে নিশ্চয় দিতে পারবে এই বিপদের সময়ে।

ডায়না সব শুনে বলল—"তাহলে তুমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও গ্লাসগো।"

"তা তো যাবই। কিন্তু গিয়েও র‍্যাশলিকে খুঁজে পাব কি? না পেলে তো আমার বাবার সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিষয় সম্পত্তি, মানসম্ভ্রম—সব অতীতের স্বপ্নে পরিণত হবে।"

ডায়না ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"দেনা শোধের দিন কবে?"

হিসাব করে ফ্রাঙ্ক বলল—"আর মাত্র দশদিন বাকী আছে।"

"মাত্র দশদিন?" ডায়না ভাবতে লাগল। তারপর তাড়াতাড়ি করে একখানা চিঠি লিখে ফেলল সে। চিঠিখানার উপরে শিরনামা লিখে সেটা আবার ভরে ফেলল আর একখানা সাদা খামের ভিতর। তারপর ফ্রাঙ্কের হাতে সেটা দিয়ে বলল—"কোন চেষ্টাতেই যদি র‍্যাশলির হাত থেকে হুণ্ডি উদ্ধার করতে না পার, তাহলে এই চিঠির উপরের সাদা খাম ছিঁড়ে ফেলে চিঠিখানা যার নামে লেখা হল, তাকে দেবে। তার দ্বারা তোমার সাহায্য হবে বলেই আশা করি।"

"কিন্তু তাকে আমি ঠিক সময়ে খুঁজে পাব তো?" জিজ্ঞাসা করে ফ্রাঙ্ক।

"পাবে। তোমার কাছাকাছিই সে থাকবে। থাকতে বলব আমি তাকে।"

ফ্রাঙ্ক অবাক্ হয়ে যায়। কাছাকাছি থাকবে? সাহায্য করবার মত লোক? ডায়নার কথাতেই থাকবে? ডায়নার এমন ক্ষমতা আছে তাহলে, যাতে শক্তিশালী লোকেরা তার ইশারায় ওঠে বসে? এ আবার কী রহস্য?

ডায়না তাকে আর ভাবতে দেয় না, বলে ওঠে—"আগে থাকতে চিঠির শিরনামা কিন্তু দেখো না। দশদিনের কাছাকাছি পৌঁছেও যদি দেখ যে র‍্যাশলির পাত্তা পেলে না, তাহলেই এ চিঠি ব্যবহার

কোরো। আর তার আগেই যদি পাত্তা পেয়ে যাও, এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিও, শিরনামা না দেখেই।"

ফ্রাঙ্ক আরও বিস্মিত হল, কিন্তু রাজী না হয়ে সে করবে কী? উপকারিণীর কথার অবাধ্য তো হওয়া যায় না। থাকুক তার অনুগত লোকদের পরিচয় ফ্রাঙ্কের অজানা! তার নিজের কাজ যদি উদ্ধার হয়ে যায়, তবে ওদের পরিচয় জেনে ফ্রাঙ্কের লাভই বা কী?

লাভ তো নেই-ই, বরং ক্ষতিও থাকতে পারে। ডায়না ক্যাথলিক, তার দলের লোকেরাও ক্যাথলিক। ফ্রাঙ্ক নিজে প্রোটেস্টাণ্ট। ক্যাথলিকে প্রোটেস্টাণ্টে বর্তমান মুহূর্তে ঘোর শত্রুতা চলছে। ক্যাথলিক জেমস কেড়ে নিতে চাইছেন প্রোটেস্টাণ্ট রাজা জর্জের সিংহাসন। ডায়নার পিতা আবার সেই জেমসের ডান হাত। হয়ত এ চিঠি ডায়না তার বাবার নামেই লিখেছে, কিংবা বাবার কোন সহকারীর নামে। নিতান্ত বিপদে না পড়লে, একেবারে নিরুপায় না হলে এ পত্রের ব্যবহারই করবে না ফ্রাঙ্ক। সাধ করে সে রাজদ্রোহী ক্যাথলিকদের সংশ্রবে আসবে না।

তবে ডায়না? সেও রাজদ্রোহী বটে। কিন্তু তার কথা আলাদা! ফ্রাঙ্ক তাকে পর ভাবতে পারে না!

"তুমি তাহলে কবে যাচ্ছ?" জিজ্ঞাসা করে ডায়না।

"আজই শেষ রাত্রে।"

একটা নিশ্বাস ফেলে ডায়না বলে—"তাহলে এই বোধ হয় জীবনে আমাদের শেষ দেখা।"

"কেন? কেন?" চমকে ওঠে ফ্রাঙ্ক—"শেষ দেখা কেন?"

"দিনকাল খারাপ, কখন কী ঘটে যায় দেশে! জান তো তুমি, আর আমি—দুইজনে দুই দলে!" ডায়নার গলার স্বর ভাল শোনা যায় না।

মালী এণ্ড্রুর সঙ্গে এই কয়দিনে খুব আলাপ হয়েছে ফ্রাঙ্কের। লোকটা মিথ্যুক, স্বার্থপর এবং ফাঁকিবাজ। কিন্তু খুব চালাক, আর

এদিক্‌কার পথঘাট তার নখদর্পণে। কারণ তার বাড়ি এই পাহাড় অঞ্চলেই। ফ্রাঙ্ক গিয়ে তাকে বলল—"তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে গ্লাসগো পৌঁছে দিতে পার? সবচেয়ে সোজা রাস্তায়? রাজপথ দিয়ে যেতে হলে সময় বেশী লাগবে, আমি চাই খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে।"

এণ্ডরু বলল—"ঠিকমত মজুরি দেন যদি, কেন পারব না? এখানে আমার কাজটা অন্য কারও হাতে গছিয়ে দিয়ে আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে। আর সোজা রাস্তার কথা যদি বলেন, এমন রাস্তা আমি জানি, যাতে কাঠবিড়ালী আর হাইল্যাণ্ডার ছাড়া আর কেউ চলতে পারে না। কিন্তু চলতে পারলে অর্ধেক সময়েই গ্লাসগো পৌঁছোনো যায়।"

স্কটল্যাণ্ডের কাছাকাছি পাহাড়িয়া অঞ্চলটাকেই বলা হয় হাইল্যাণ্ডস্ বা উঁচু দেশ, আর সেখানকার অধিবাসী পাহাড়িয়া উপজাতিদেরই সাধারণভাবে বলা হয় হাইল্যাণ্ডার। এরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কোনও দুটো সম্প্রদায়ের ভিতরে সদ্ভাব নেই। প্রায় সব সময়েই দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে। কখনও কখনও সে সব দাঙ্গা এমন বিরাট আর ব্যাপকভাবে চলতে থাকে যে মনে হয় রীতিমত যুদ্ধই চলেছে, পাহাড়ের আড়ালে আর জঙ্গলের অলিতে গলিতে।

ফ্রাঙ্ক বলল—"আমি কাঠবিড়ালী তো নইই, এমনকি হাইল্যাণ্ডারও নই; তবু ঐ সোজা রাস্তাতেই আমায় যেতে হবে। যত শীগগির পারি গ্লাসগো আমার পৌছানো চাইই।"

ভোর রাত্রে রওনা হতে হবে। রাত্রে ঘুমোনো ঠিক হবে না। কী জানি যদি ঠিক সময় ঘুম না ভাঙে! ফ্রাঙ্ক ঠিক করল সারা রাত সে জেগেই কাটিয়ে দেবে। সার হিলডিব্রাণ্ডের সঙ্গে যাওয়ার আগে আর দেখা করা উচিত হবে না। ভদ্রলোক নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত ফ্রাঙ্কের সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহারই করেছেন। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছে ফ্রাঙ্কের যে, বৃদ্ধ বুঝিবা তাকে একটু স্নেহের চোখেই দেখতে শুরু করেছেন। তবু এসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত মনে

করল না ফ্রাঙ্ক। মুখোমুখি বিদায় নিতে গেলে এমন হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে অনেক। সত্য কথা বলতে হলে র‍্যাশলির কুকীর্তির কথা তাঁকে জানাতে হবে। তাতে ব্যথা পাবেন উনি। আর সে ব্যথা থেকে ওঁকে বাঁচাতে হলে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে ফ্রাঙ্ককে। যেচে কেন সে ঝামেলা পোহাতে যাবে সে ?

আতিথেয়েতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে, আর সাক্ষাৎ করে যাওয়া সম্ভব হল না বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে ফ্রাঙ্ক একখানা চিঠি লিখল, আর চিঠিখানা বিছানার উপর রেখে দিয়ে সে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল। লণ্ডন থেকে আসবার সময় সে সামান্যই জিনিস সঙ্গে এনেছিল, এখান থেকে বেরুবার সময় তার সেই সামান্য জিনিসপত্রেরও কিছু অংশ ফেলে যেতে হল। কারণ আসবার সময় সে ধীরে সুস্থে আসতে পেরেছিল বাঁধা সড়ক দিয়ে, এখন তাকে যেতে হবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে। এসময় সঙ্গে মাল যত কম থাকে, ততই ভাল।

পোশাক পরে সে বিছানার উপর ঠায় বসে রইল কিছুক্ষণ কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা যায় কতক্ষণ ? বিরক্ত হয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে গেল আস্তাবলে, সেখানে নিজের ঘোড়াটাকে নিজে সাজিয়ে বার করে এনে বাগানের ভিতর বাঁধল। এই বাগানেই এণ্ডরুর আসবার কথা।

এণ্ডরুর আসতে দেরি আছে এখনও। ফ্রাঙ্ক পায়চারি করতে লাগল বাগানে। এদিকটায় তরিতরকারি বা ফুলের বাগান নেই, আছে বড় বড় ফলের গাছ। এমন ঘন ঘন গাছগুলো খাড়া হয়ে আছে যে জায়গাটা দিনের বেলাতেও প্রায় অন্ধকার হয়েই থাকে। চাকরদের ধারণা ভূত আছে এইখানটাতে। সে নাকি দিনের বেলায় গাছে গাছে লুকিয়ে থাকে, রাতে প্রাসাদের এই পিছন মহলটাতে ঢুকে আলো হাতে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়। আলো নাকি দেখেছে চাকরদের ভিতর কেউ কেউ। ভূতের আবার আলোর দরকার কী,—

এটা তারা বুঝতে পারেনি, তা ঠিক। তবু ও আলো যে ভূতের আলো, এবিষয়ে তাদের একটুও সন্দেহ নেই।

ফ্রাঙ্ক এসব গালগল্পও শুনেছে বইকি! চাষাভুষোর কুসংস্কার বলে এসবকে উড়িয়েও দিয়েছে! কিন্তু আজ এই নিঝঝুম রাতেরবেলায় নিছক একা একা এই ঘুরঘুট্টি আঁধার বাগানের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে তারও কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। অনিবার্যভাবেই মনে পড়তে লাগল সেই সব ভূতের গল্প, যা অসওয়ালডিস্টোন হলে এই কিছুদিনের ভিতর সে শুনেছে। সে হাসবার চেষ্টা করল মনে মনে, কিন্তু হাসি যেন আসতেই চায় না।

হঠাৎ তাকে চমকে উঠতে হল। প্রাসাদের পিছন মহলে সত্যিই আলো দেখা যায় যে!

যে ভয়টা ফ্রাঙ্কের ঘাড়ে ভর করব করব করছিল, সে আর কায়দা করতে পারল না ওকে। আলো দেখা মাত্রই তার মনের জড়তা একেবারে কেটে গেল। নিশ্চয় মানুষ আছে ওই আলোর পিছনে। মাঠে জলায় আপনাআপনি আগুন জ্বলে উঠতে পারে, দোতলা আট্টালিকায় ঘরের ভিতর তা পারে না।

মানুষ আছে; কিন্তু কে সেই মানুষ? এই নিশুতি রাতে এই পিছন-মহলে কোন্ মানুষের চলাফেরার দরকার হয় আলো জ্বেলে? এদিক্‌টাতে ডায়না ভিন্ন অন্য কেউ বাস করে না, এটা ফ্রাঙ্ক ভালরকমই জানে। কিন্তু ডায়না কেন এত রাতে জেগে থাকবে, আর এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াবে? আজই শুধু ঘুরছে, এমনও তো নয়! চাকরেরা এ আলো প্রায়ই দেখে থাকে। তাহলে তার অর্থ প্রায়ই ডায়নাকে এইভাবে ঘুরতে হয়। কিন্তু কেন?

হঠাৎ আলোর পাশে মানুষের ছায়া দেখা গেল। কী আশ্চর্য! একটা ছায়া তো নয়! দুটো!

একটা হয়ত ডায়নার ছায়া, অন্যটা কার তবে?

অন্য কোন মেয়ে হলে ফ্রাঙ্ক হয়ত তার সম্বন্ধে খারাপ কোন ধারণাই করত। কিন্তু ডায়নাকে তো সে জানে! সে যে ফুলের মত

পবিত্র, দেবীর মত মহীয়সী, তা তো ফ্রাঙ্কের অজানা নয়! তবে এর অর্থ কী? কে হতে পারে ঐ দ্বিতীয় লোকটা, যার ছায়া ডায়নার ছায়ার পাশে দেখা যাচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে?

ধীরে ধীরে একটা কথা মনে হল ফ্রাঙ্কের।

পাদরি ভগানের কথা সে শুনেছে। তিনি ক্যাথলিক পাদরি। প্রায়ই তিনি আসেন অসওয়ালডিস্টোনে, এবং থেকেও যান দুই-চার দিন। অসীম প্রতিপত্তি তাঁর এ বাড়িতে। কারণ সার হিলডিব্রাণ্ডের গোটা পরিবারটাই গোঁড়া ক্যাথলিক। তিনি আসবেন শুনলে বাড়ির সব লোক তটস্থ হয়ে ওঠে। এত যে হৈ-হুল্লোড় মাতলামি, তাও ঢিমিয়ে যায় যেন। কিন্তু আশ্চর্য! পাদরি ভগানকে চাকরেরা কেউ চোখে দেখতে পায় না, কখনও চোখে দেখেনি। তিনি যখনই আসেন, রাত্রে আসেন। কোন্ মহলে কোন্ ঘরে তিনি বাস করেন, তা চাকরদের জানতে দেওয়া হয় না। খাওয়ার টেবিলে তাঁকে ওরা দেখেনি কোনদিন। তাঁর কাছে কোন জিনিস পৌঁছে দেবার জন্যে কখনও ডাক পড়েনি কোন ভৃত্যের। পাদরি ভগান তাই এই প্রাসাদের একটা রহস্য।

ডায়নার পাশের ঐ ছায়া যদি ভগানের হয়?

তাও তো হওয়া উচিত নয়। এত রাতে একাকিনী কুমারী মেয়ে—পাদরির সঙ্গেও তার ঘোরাফেরা তো ঠিক নয়! কী কারণ থাকতে পারে এর? ধর্মকথার আলোচনা? দিনের বেলা, সন্ধ্যাবেলা তার সময় হয় না?

না, ধর্মকথা হতে পারে না। হতে পারে রাজনীতি। পাদরি ভগান সাগরপারে নির্বাসিত রাজা জেমসের অনুরক্ত। ডায়না তো জেমসের দলের বটেই, কারণ তার বাবা সার ফ্রেডারিকই এ অঞ্চলে জেমস-রাজার প্রতিনিধি। এখন ভগানও যদি পাদরির ছদ্মবেশে জেমসের গুপ্তচর হন—তাহলে এই নিশীথ রাতের চলাফেরা ও সলাপরামর্শের কৈফিয়ত একটা থাকলেও থাকতে পারে।

এইবার জানালা থেকে ছায়া দুটি সরে গেল। আলোটাও দেখা

গেল না আর। এগুরু তখনও আসে না। আবার শুরু হয় ফ্রাঙ্কের পায়চারি নিবিড় আঁধারে। এবারে আর ভূতের ভয় নেই। ভূতকে সে ভগানের বেশে চাক্ষুষ দেখেছে।

বহুক্ষণ পরে এগুরু এল। কৈফিয়ত দিল—ঘোড়া যোগাড় করতে দেরি হয়েছে।

গোড়া থেকেই পাহাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল এগুরু, ফ্রাঙ্ককে নিয়ে। রাস্তা নেই, তবু সে এগিয়ে যায়। ফ্রাঙ্ক মাঝে মাঝেই বলে—"দেখো বাপু, পথ যেন ভুলে বোসো না। তাহলেই দেরি হবে, আমার কাজটাও পণ্ড হবে।"

এগুরু অভয় দেয় তাকে। জাঁক করে বলে—"এই সব পাহাড়ের চোরাগোপ্তা সুড়ঙ্গ পথে চলে চলে জীবন কেটেছে আমার। চোখবুজে গ্লাসগো চলে যেতে পারি। নির্ভয়ে আসুন আপনি।"

কখনও চড়াই, কখনও উতরাই, কখনও খদের গা ঘেঁষে, কখনও বা হ্রদের তীরে তীরে—চলতে থাকে ওরা। কষ্টের অবধি নেই। কিন্তু আনন্দেরও সীমা নেই। প্রকৃতির এত শোভা যে পৃথিবীতে কোথাও থাকতে পারে, কবি হয়েও ফ্রাঙ্ক তা কল্পনা করেনি কোনদিন। কিছুদিন আগে হলে সে হয়ত স্থির করে ফেলত—এই পরীর দেশের মত সুন্দর পাহাড়-অঞ্চল ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না। এইখানে হ্রদের ধারে ছোট্ট একটুখানি কুটীর বেঁধে কাব্যচর্চা করে আর কবিতা লিখে সে জীবন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু গত কালকের চিঠি তার চিন্তার ধারারই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কাব্যলক্ষ্মীর সেবার কথা তার মাথায় আর ঠাঁই পাচ্ছে না। প্রাণপণ বেগে সে ছুটে চলেছে কর্মজগতের দেউড়ি লক্ষ্য করে। ঐ ওপারে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে বিরাট কর্তব্যের বোঝা। পলাতক র‍্যাশলির সন্ধান, তার কবল থেকে কোম্পানির কাগজপত্র উদ্ধার, আসন্ন সর্বনাশ থেকে পৈতৃক ব্যবসাটাকে বাঁচানো।

আজ প্রকৃতির সৌন্দর্য তাকে ক্ষণিকের আনন্দ দিতে পারে বটে, কিন্তু বেঁধে রাখতে আর পারে না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত সে ছুটে চলেছে।

চার

সাধারণত পয়লা নম্বরের মিথ্যুক হলেও গ্লাসগোর ব্যাপারে এগুরু যে মিথ্যা বলেনি, তার প্রমাণ পেতে দেরি হল না। দেখা গেল—গ্লাসগোর রাস্তা সে তো চেনেই, শহরটাকেও সে চেনে মোটামুটি রকম। তন্ন তন্ন করে চেনা সম্ভব নয়, কারণ আজ কয়েক বছর সে শহরের বাইরে কাটাচ্ছে অসওয়ালডিস্টোন হলে। এদিকে শহর তার জন্যে অপেক্ষা না করে বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

যাই হোক, ম্যাক্‌ভাইটির বাড়ি চেনে এগুরু।

ম্যাক্‌ভাইটির নাম সদ্য জেনেছে ফ্রাঙ্ক আওয়েনের চিঠিতে। আওয়েন দুটি লোকের নাম দিয়েছিলেন চিঠিতে। ম্যাক্‌ভাইটি আর জার্ভি। এঁরা দু'জনেই গ্লাসগোতে অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির এজেন্ট বা প্রতিনিধি। অসওয়ালডিস্টোনদের যা কিছু কাজকারবার হয় এ অঞ্চলে, এই দু'জনের কারও না কারও মারফত হয়। ম্যাক্‌ভাইটিদের হাত দিয়েই বেশী হয়, জার্ভির হাত দিয়ে একটু কম। কারণ ওরই মধ্যে ম্যাক্‌ভাইটির ব্যবহার ভাল। হিসাবপত্রের ব্যাপারে সব সময়ে অসওয়ালডিস্টোনদের উপরেই নির্ভর করে। কমিশন বাড়িয়ে দেবার জন্যে জুলুম করে না, সর্বদাই একান্ত নম্র—যেন লণ্ডন-ওয়ালা অসওয়ালডিস্টোনদের দয়ার উপরে নির্ভর করেই গ্লাসগোর ম্যাক্‌ভাইটি বেঁচে আছে।

ওদিকে জার্ভির প্রকৃতি একেবারে অন্যরকম। হিসাব-পত্রে ভয়ানক কড়াকড়ি তার, নিজের পাওনাগণ্ডা সম্বন্ধে ভয়ানক হুঁশিয়ার। মতের অমিল হলে রীতিমত শক্ত শক্ত কথা লেখে অসওয়ালডিস্টোনকে। ভাবে ভঙ্গীতে সব সময়ে দেখাতে চায় যে ব্যবসার দিক্ দিয়ে খাটো হলেও সে অসওয়ালডিস্টোনদের কিছুমাত্র পরোয়া করে না। ওদের

খাতিরে নিজের একটি ফুটো পেনীও লোকসান করতে সে রাজী নয়।

এইসব কারণে লণ্ডনের কোম্পানিতে ম্যাক্ভাইটির যত সমাদর, জার্ভির তত নয়। আওয়েন লিখেছেন, গ্লাসগোতে তিনি ম্যাক্ভাই-টিদের ওখানেই উঠবেন, ফ্রাঙ্ক যেন সেখানে গিয়েই আওয়েনের খোঁজ নেয়।

এণ্ডরু সেখানেই নিয়ে গেল ফ্রাঙ্ককে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায়। ম্যাক্ভাইটি বাড়িতে নেই, আওয়েনও না। উপাসনার জন্যে ম্যাক্ভাইটি গির্জায় গিয়েছেন, অতিথিকেও সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছেন। গির্জায় গেলে সেখানেই দেখা হতে পারে বলে ম্যাক্ভাইটির ভৃত্য জানাল।

ফ্রাঙ্কের কী জানি কেন মনে হল—লোকটা কোন একটা কথা চেপে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। আর কেমন যেন ঠাট্টার সুরে কথা কইছে তার সঙ্গে। তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তার নয় তখন। সে চলল গির্জার উদ্দেশে। কোন্ গির্জায় যেতে হবে, তা ভৃত্যই বলে দিয়েছে।

ফ্রাঙ্কের মতলব ছিল—গির্জার বাইরে কোথাও বসে সে বিশ্রাম করবে, যতক্ষণ না উপাসনা শেষ হয়। শেষ হলে তারপর ভিতরে গিয়ে ম্যাক্ভাইটিকে খুঁজে নেবে। খুঁজতে বেগ পেতে হবে না, কারণ সবজান্তা এণ্ডরু ম্যাক্ভাইটিকেও চেনে।

কিন্তু এণ্ডরু এতে সায় দিল না। আজ রবিবার, শহরসুদ্ধ লোক কোন না কোন গির্জায় উপাসনায় যোগ দিয়েছে। গ্লাসগো শহরে ও বিষয়ে ভয়ানক কড়াকড়ি। কেউ ধর্মের ব্যাপারে খামখেয়ালি দেখাতে পারবে না। রবিবার দিনটিতে সকালে বিকালে উপাসনা করা চাইই প্রত্যেকের। না করলে গির্জার আইনে দণ্ডনীয় হবে সে। এ আইন ইংলণ্ডে নেই। ফ্রাঙ্ক এইবার উপলব্ধি করল—ইংলণ্ডে আর স্কটল্যাণ্ডে তফাত আছে।

যাই হোক—যে দেশে যা রীতি, সেদেশে তাই মেনে চলাই ভাল। ফ্রাঙ্ক আর এগুরু গির্জায় ঢুকে পড়ল।

ভিতরে দারুণ ভিড়। সকলের পিছনে কোনরকমে একটু জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল ফ্রাঙ্ক। পাদরি তখন চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আসল উপাসনা শেষ হয়েছে, এটা পাদরি সাহেবের নিজস্ব কথা নিজের পছন্দমত উপদেশ বর্ষণ।

পাদরির দিকে মনোযোগ দেবার ভান করে ফ্রাঙ্ক নিজের সমস্যার কথাই ভাবছে, এমন সময় ঠিক তার পিছনে, ঠিক তার গলার উপরে কে যেন নিশ্বাস ফেলল। এত কাছে, একেবারে ঘাড়ের উপর কে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ? গুণ্ডা বদমাইশ নয় তো ? ফ্রাঙ্ক তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তাকাতে যাবে, এমন সময়ে কে যেন তার কানে কানে অতি চুপি চুপি বলে উঠল—"কথা বোলো না, ঘাড় ফিরিও না, আমি তোমার বন্ধু।"

এ স্বর কি ফ্রাঙ্কের পরিচিত ? ঠিক ঠাহর করতে না পারলেও ফ্রাঙ্ক চুপ করেই রইল। আর তার দৃষ্টিও পাদরির মুখের উপর থেকে একটুও এদিকে ওদিকে সরলো না।

অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই পিছন থেকে, যদিও ঘাড়ের উপরে এখনও মাঝে মাঝে নিশ্বাস পড়ছে। আবারও কথা শোনা যাবে, এই আশায় ফ্রাঙ্ক ধৈর্য ধরেই রইল।

আশা পূর্ণ হল। কানে কানে আবার পিছনের লোকটি বলল— "এ শহরে তুমি নিরাপদ নও। আমি তোমার উপরে নজর রেখেছি।"

নিরাপদ ? না, ফ্রাঙ্ক নিশ্চয়ই নিরাপদ নয়, কারণ র‍্যাশলি যদি এ শহরে তার উপস্থিতির কথা জানতে পারে, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এ লোক কেন ফ্রাঙ্কের উপর নজর রাখছে ? তার এ অযাচিত, অহেতুক বন্ধুত্বই বা কেন ?

আবার কিছুক্ষণ কোন সাড়া নেই। ওদিকে পাদরি বক্তৃতা শেষ করছেন। তিনি বেদী থেকে নেমে গেলেই জনতাও হুড়হুড় করে

গীর্জা থেকে বেরিয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে ফ্রাঙ্ককেও বেরুতে হবে। তার আগে পিছন থেকে আর কোন উপদেশ পাওয়া যাবে না নাকি?

না না, পাওয়া গেল বইকি!—"ঠিক রাত বারোটায় ক্লাইভ নদীর পুলের উপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। নির্ভয়ে দেখা কোরো।"

ফ্রাঙ্ক যখন পিছন ফিরে তাকাল, কেউ নেই তার পিছনে। লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গিয়েছে।

কিন্তু তাকে খুঁজবারও সুযোগ হল না। এগুরু কোথা থেকে ছুটে এসে বলল—"মিস্টার ম্যাক্‌ভাইটিকে যদি ধরতে হয় তবে শীগ্‌গির আসুন। ভিড়ের জন্যে তিনি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।"

ফ্রাঙ্ক ছুটল এগুরুর পিছনে। গীর্জার ভিতর দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে এগুরু দেখিয়ে দিল একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। সুন্দর চেহারা, দামী বেশভূষা, সঙ্গের মহিলাটি অবশ্য তাঁর স্ত্রী, তিনিও পুরোপুরি অভিজাত মহিলা।

কিন্তু তবু ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে যেতে পারল না ফ্রাঙ্ক। কে যেন তাকে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দিল।

ভদ্রলোকের সুন্দর মুখে এমন একটা শাঠ্যের ছাপ, এমন একটা নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির আভাস—এ লোকের কাছে বিপন্ন অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানি কোন সাহায্য পাবে বলে ধারণাই করতে পারল না ফ্রাঙ্ক।

তার উপর, আশ্চর্য! আওয়েন গেলেন কোথায়? তিনি ম্যাক্‌ভাইটির বাড়িতে নেই, ম্যাক্‌ভাইটির সঙ্গে গীর্জায় আসেননি, তবে গেলেন কোথায় তিনি?

ফ্রাঙ্কের হঠাৎ মনে পড়ল—ম্যাক্‌ভাইটির বাড়ির সেই ভৃত্যটার রহস্যপূর্ণ আচরণ। সে যেন কী একটা কথা চেপে গিয়েছিল। তার চোখে মুখে যেন একটা বিদ্রূপের আভাস দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

এর মানে কী? আওয়েনের কি কোন বিপদ হয়েছে?

যদি হয়েই থাকে তাহলে ম্যাক্‌ভাইটি আছে সে বিপদের মুলে, এতে সন্দেহ নেই ফ্র্যাঙ্কের। ভৃত্যের আচরণ আর ম্যাক্‌ভাইটির মুখের চেহারা—এ থেকেই ফ্র্যাঙ্ক এই সিদ্ধান্ত করে বসল।

না, এখন নয়। অজানা বন্ধুর সঙ্গে ক্লাইড নদীর সেতুর উপরে দেখা করা যাক আগে। সে বলেছে—'তুমি নিরাপদ নও এ শহরে।' মনে হচ্ছে সে কথা সত্যি। আওয়েন বোধ হয় নিরাপদে নেই। নিরাপদে থাকলে এতক্ষণ দেখা হতই, হয় ম্যাক্‌ভাইটির বাড়িতে, নয় তো এই গীর্জায়।

শহরে এসে প্রথমেই একটা হোটেল ঠিক করে ফেলেছিল ফ্র্যাঙ্ক। ঘোড়া দুটো সেখানেই আছে। এগুরুকে নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক এখন সেইখানেই চলল। খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক, তার পর সেতুর দিকে বেরুতে হবে।

ডিনারের পর প্রভুকে বেরুতে দেখে এগুরুও সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই তাকে সঙ্গে নিল না ফ্র্যাঙ্ক। এগুরুকে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে না সে। কোন গোপন কথা পারতপক্ষে তাকে জানতে দেওয়া উচিত নয়।

সেতুর উপর গিয়ে যখন পৌঁছলো ফ্র্যাঙ্ক, তখনও রাত বারোটা বাজতে দেরি আছে। একা একা সেতুর এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত কেবলই সে পায়চারি করতে থাকল। যেখানে দিনের বেলায় লোক ঠেলে চলা যায় না, এখন সেখানে লোক নেই বললেই হয়। কদাচিৎ কেউ আসে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পুলটা পেরিয়ে যায়। ফ্র্যাঙ্ক লক্ষ্য করল—এরকম নিঃসঙ্গ পথচারীরা ভয়ে ভয়ে দু'চারবার তাকিয়ে যায় তার দিকে। ওকে তারা গুণ্ডা বদমাইশ শ্রেণীর লোক বলেই ধরে নিয়েছে নিশ্চয়।

কাছেই কোন গীর্জায় ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং করে। বারোটাই বাজলো বটে। কিন্তু কই, সে রহস্যময় বন্ধু তবু তো আসে না! অস্থির ভাবে

এদিক্ ওদিক্ ঘুরতে লাগল ফ্রাঙ্ক। ঠিক কোন্ দিক্ দিয়ে যে সে আসবে, জানা নেই তো !

অবশেষে, ঐ যে একটা লোক !

কিন্তু মাঝে মাঝে আরও তো কত লোক আসছে যাচ্ছে ! ঠিক যে লোকটিকে ফ্রাঙ্কের দরকার, এ সেই কিনা তা হঠাৎ বোঝা যাবে কেমন করে ?

অবশ্য তা বোঝা গেল। ফ্রাঙ্কের মত ও লোকটিও পায়চারি করছে এদিকে ওদিকে, ইতস্ততঃ তাকাচ্ছে চঞ্চল ভাবে। ফ্রাঙ্ক একবার তার পাশ দিয়ে চলে গেল, আবার ফিরে এল তার পাশে। ও লোকটি তখন বলল—"আপনি এত রাতেও ঘুরছেন দেখছি !"

"আপনিও তো !" বলে ফ্রাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কারও জন্যে অপেক্ষায় আছেন বোধ হয় ?"

"গীর্জায় এক বন্ধু বলেছিলেন—"

"আসুন তাহলে !" বলেই লোকটি শহরের দিকে পা বাড়াল।

তার অনুসরণ করতে করতেই ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল—"আপনিই ?"

সে কথার সোজা জবাব না দিয়ে লোকটি বলল—"আপনাদের কেরানী আওয়েন সাহেবের দেখা পাননি তো ?"

"না, পাইনি !" উৎসুক হয়ে ফ্রাঙ্ক বলে উঠল—"অথচ তাঁকে না পেলে আমার গ্লাসগো আসাই বৃথা হবে। আপনি জানেন নাকি তাঁর কোন খবর ?"

"খবর তাঁর ভাল নয়। তিনি ছোটখাট একটু বিপদেই পড়েছেন। সে বিপদে আপনিও জড়িয়ে পড়তে পারেন আগে থাকতে সাবধান না হলে। সেই কথাই আপনাকে গীর্জাতে বলেছিলাম আমি।"

"কী বিপদে পড়েছেন আওয়েন ?" ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ফ্রাঙ্ক।

"আমার মুখে না শুনে নিজের চোখে এসে দেখুন সেটা। পথ চলতে চলতে বেশী কথা বলা ভাল নয়। আপনার শত্রুরা আপনার

উপরেও চোখ রেখেছে হয়তো। আমাদের পরামর্শ যদি কোনমতে তাদের কানে পৌঁছোয়—”

এই পর্যন্ত বলেই অজানা পুরুষ কথা বন্ধ করল। ফ্র্যাঙ্ককে অগত্যা নীরবেই পথ চলতে হয়। কিন্তু এ সে কোথায় চলেছে? শহরের এ অংশে আজ সারা দিনমানে একবারও আসেনি সে। শহরে সে একেবারে নতুন, তারই সুযোগ নিয়ে র‍্যাশলিই তাকে ফাঁদে ফেলবার কোন ফিকির করেনি তো? এই রহস্যময় মাঝরাতের বন্ধু র‍্যাশলিরই কোন চর নয় তো?

এমন ভয় হতে লাগল ফ্র্যাঙ্কের যে এক সময়ে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে শক্ত হয়ে বলে উঠল—“অনেক দূর তো এলাম। কোথায় আমরা চলেছি, তা খুলে না বললে আমি আর এক পাও যাব না।”

লোকটিও থামল এবং ফিরে দাঁড়াল—“আপনার ভয় করছে। কিন্তু ভয়টা কিসের, বলুন তো? প্রাণের ভয়? জোয়ান পুরুষ, কোমরে তরোয়াল ঝুলছে, তবু প্রাণের ভয়ে অস্থির? আমি তো একা একা যমের বাড়ি যেতেও ভয় পাই না।”

একটু থেমে সে আবার বলল—“আমার সঙ্গে না এলে আওয়েনের দেখা আপনি পাবেন না। কতদিনের মধ্যে পাবেন না, তার ঠিক নেই। এখন আমার সঙ্গে আসা না আসা আপনার ইচ্ছে।”

ফ্র্যাঙ্ক দমে গেল। আওয়েনের খবর পাওয়া একান্তই দরকার। তার জন্যে নিজে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় যদি, তাও নিতে হবে। সে আবার এগিয়ে চলল।

আরও বেশ কিছু দূর। কখনও সরু গলি, কখনও চওড়া রাস্তা দিয়ে। রাস্তা দিয়ে পুলিস আসতে দেখলেই ফ্র্যাঙ্কের বন্ধু কোন বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে।

ফ্র্যাঙ্ক কারণ জানতে চাইল—“কিসের ভয়ে পালাব আমরা?”

হেসে উত্তর দিল লোকটি—“পালাব এই কারণে যে পুলিসে ধরলে আমার হবে ফাঁসি এবং আপনার আর কিছু না হোক—দুই একদিন হাজত বাস অনিবার্য! কোথায় যাচ্ছেন এত রাতে পলাতক

দস্যুর সঙ্গে, এর কোন সন্তোষজনক উত্তর আপনি দিতে পারবেন কি?"

ফ্রাঙ্ক যেন পাথর বনে গেল এই উত্তর শুনে। তার অজানা বন্ধুটি পলাতক দস্যু? এমনই সাংঘাতিক দস্যু যে ধরা পড়লেই তার ফাঁসি হবে? অথচ এই দস্যু নিজের জীবন বিপন্ন করে শহরের রাজপথে ভ্রমণ করছে—ফ্রাঙ্ককে আওয়েনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে? এ দুরূহ সমস্যার সমাধান সে কোনমতেই খুঁজে পায় না। কিসের জন্যে এই সমাজবিরোধী লোকটা এক নিঃসম্পর্কীয় ইংরেজের ব্যাপারে এতখানি মাথা গলাচ্ছে?

কিন্তু আর ভাববার সময় হল না। একটা বড় বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্কের অজানা বন্ধু ধীরে ধীরে দরজায় ধাক্কা দিল। ফ্রাঙ্ক লক্ষ্য করল এ বাড়িটা বড় হলেও এ দরজাটা ছোট, এবং দরজাটা কাঠের নয়, লোহার।

বার কতক ধাক্কা দেওয়ার পরে মাথার উপরে একটা লোহার গরাদে দেওয়া ছোট্ট জানালার পাল্লা খুলে কে একজন জিজ্ঞাসা করল—"রাত দুপুরে কে এসে জেলখানায় হল্লা করছ হে? আর সময় পেলে না মরবার?"

জেলখানা? এটা জেলখানা?

বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়ে ফ্রাঙ্ক একেবারে দিশেহারা। আওয়েন জেলখানায়? আর তার পথপ্রদর্শক নিজে ফেরার ডাকাত হয়েও জেলখানায় এসেছে, মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করে? এ লোকটা কি জীবনকে কোন দামই দেয় না? সেই যে কবির কথায় বলা হয়েছে—"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন?" সেই কথাই কি নিজের কাজের ভিতর দিয়ে হাতেকলমে প্রমাণ করতে চাইছে ও?

"ওহে ডুগাল, তুমি কি তোমার সর্দারকেও চিনতে পারছ না নাকি?" এবার লোকটির কথায় পাওয়া গেল একটা সাংঘাতিক সুরেলা টান। যে টান ফ্রাঙ্ক এ অঞ্চলে আসবার পরে হাইল্যাণ্ডারদের কথার ভিতরে লক্ষ্য করেছে।

আবার সেই একই রকম সুরেলা টান ডুগালের কথাতেও, যে লোকটি নাকি এইমাত্র কথা বলছিল জেলখানার ভিতর থেকে।

এবার ডুগাল যেন ভয়ানক চমকে গেল। দুর্বোধ্য ভাষায় ঝড়ের বেগে কী সব বলতে বলতে সে লোহার দরজার ভিতর দিকের হুড়কো খুলল, তালা খুলল, তারপর ধীরে ধীরে টেনে টেনে দরজার একটা পাল্লা অর্ধেকটা ফাঁক করে ফেলল। সবটা খুলতে গেলে বা জোরে টেনে খুলতে গেলে শব্দ হওয়ার ভয় ষোল আনাই আছে। সেই শব্দটা বাঁচাবার জন্যেই বোধ হয় ডুগালের এই সতর্কতা।

দরজা একটুখানি ফাঁক হতেই সর্দার তার ভিতর দিয়ে কাত হয়ে ঢুকে পড়ল, অগত্যা ফ্রাঙ্ককেও ঢুকতে হল তার পিছনে পিছনে। ডুগাল তক্ষুনি আবার বন্ধ করে দিল দরজা।

বন্ধ করেই সে শুরু করল এক আশ্চর্য অভিনয়। লাফিয়ে এসে সে তার সর্দারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। সর্দারের হাত টেনে নিয়ে বার বার তাতে চুমো খেতে লাগল, আর কখনও হাসতে হাসতে, কখনও কাঁদতে কাঁদতে সে কেবলই বলতে থাকল—"আমার সর্দার। আমার রাজা! আমার বাবা! তোমায় ভুলব আমি? আমি কি ম্যাক্‌গ্রেগর নই? আমার জান মান সব কি আমার সর্দারের জন্যই নয়? তোমার গলার স্বর শুনেও তোমায় চিনব না, এমন মতিচ্ছন্ন যেন আমার কখনও না হয়।"

সর্দার তাকে হাত ধরে তুলে বলল—"থামো থামো, ডুগাল! তুমি আমায় চিনতে পারবে—এটা নিশ্চিত না জানলে কি আর আমি এই জেলখানায় এসে ঢুকেছি? জানি যে ডুগাল যতক্ষণ জেলের দরজায় আছে, ততক্ষণ ভিতরে ঢুকেও বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সোজা।"

ডুগাল বলল—"নিশ্চয়! কিন্তু রাজা! এমন বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হয়েছে? তোমাকে যে ধরিয়ে দেবে, সে সরকার থেকে দশ হাজার পাউণ্ড ইনাম পাবে, তা কি তুমি শোনোনি?"

"শুনিনি আবার? শুনেছি বলেই তো ভাবলাম, অন্যে কেন অতগুলো অর্থ পেয়ে যায়, পায় তো আমার ডুগালটাই পেয়ে যাক!"

এই ঠাট্টার কথা শুনে ডুগাল কানে আঙুল দিয়ে আবার হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল, সর্দারই থামাল তাকে—"তুমি কি বুঝতে পারছো না যে বিশেষ গুরুতর কাজ না থাকলে আমি এতখানি বিপদ মাথায় নিয়ে এখানে কখনও আসতাম না? বাজে কথা বন্ধ করে এখন আমার কথাটা শোন।"

ডুগাল উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াল—"রাজার হুকুম শোনামাত্রই তামিল করব।"

"আওয়েন নামে এক ইংরেজ এই দেওয়ানী জেলে আটক আছেন!" বলতে শুরু করে সর্দার—"তাঁর সঙ্গে আমার এই সঙ্গীর এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার।"

ওহো! এটা তাহলে দেওয়ানী জেল! ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারে দেওয়ানী জেল বলেই এর এতটুকু দরজা। দেওয়ানী জেল বলেই এখানে অস্ত্রধারী পাহারা নেই। কিন্তু দেওয়ানী জেলেই বা আওয়েনকে আসতে হবে কেন?

দেনা করে তার পর যথাসময়ে তা পরিশোধ করতে না পারলে তবেই না দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আসতে হতে পারে! আওয়েন গ্লাসগো শহরে এই তো সবে সেদিন এসেছেন! এর মধ্যে তিনি দেনাই বা করতে গেলেন কখন, আর তার দরুন এত অল্প সময়ের ভিতরেই তাঁকে কয়েদই বা হতে হল কেন!

ফ্রাঙ্ক যতক্ষণ মনে মনে এই সব তোলপাড় করছে, ডুগাল ততক্ষণ তার ঘরের ভিতর দিকের একটা বড় দরজার গোটা চারেক বড় বড় তালা খুলে ফেলেছে। দরজা খুলতেই প্রথমে ডুগাল, তারপর সর্দার ঢুকে পড়ল ওদিক্‌কার একখানা বড় হল ঘরে। ফ্রাঙ্কও ঢুকল তাদের সাথে সাথে।

ঘরে কয়েকখানা খাটিয়া পাতা আছে। একখানা ছাড়া আর সবই খালি। সেই একখানাতে গুটিসুটি হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে একটি লোক, ডুগাল গিয়ে তার গায়েই ঠেলা দিল।

লোকটি আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসল। বলল—"এত রাতে বিরক্ত

না করলেই কি চলত না ? এ পোড়া স্কটল্যাণ্ডের সবই কি বেয়াড়া কাণ্ড ?"

সবিস্ময়ে ফ্রাঙ্ক দেখল, সেই লোকটিই আওয়েন।

ডুগালই জবাব দিল—"দেখ তোমার সাথে দেখা করতে কে এল !"

আওয়েন এক পলক দেখেই চমকে উঠলেন—"ছোট মনিব, আপনি এখানে কেন ? আপনাকেও কি ম্যাক্‌ভাইটিরা পাকড়াও করেছে নাকি ?"

"না, আমায় কেউ পাকড়াও করেনি।" জবাব দেয় ফ্রাঙ্ক— "কিন্তু আপনাকেই বা ম্যাক্‌ভাইটি পাকড়াও কেন করবে ? আপনি তো তার দেনদার নন ! আর দেনদার হলেও, মানে আপনি তো চিঠিতে লিখেছিলেন যে ম্যাক্‌ভাইটি আমাদের কোম্পানির খুব বড় বন্ধু। সব রকম সাহায্যই তার কাছে আমরা পাব !"

ঘাড় নেড়ে বিষণ্ণভাবে আওয়েন বললেন—"মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্য রকম। আপনি এই খাটিয়ায় বসুন, আমি সব কথা সংক্ষেপে বলছি আপনাকে।"

ফ্রাঙ্ক বসল। সর্দারও বসলেন—তবে অন্য খাটিয়ায়। আর ডুগাল একেবারে নিজের ঘরে চলে গেল, বাইরের দিকে কান রাখা দরকার। কারণ তার বড় আদরের রাজা, পলাতক দস্যু ম্যাক্‌গ্রেগর রয়েছেন তার খবরদারির ভিতরে। যতক্ষণ না তাঁকে সে নিরাপদে এখান থেকে বার করে দিতে পারছে, ততক্ষণ তার সোয়াস্তি নেই।

ফ্রাঙ্ক বসল, আওয়েন তাঁর গল্প শুরু করলেন—

দিন তিনেক আগে আওয়েন এসে পৌঁছোন গ্লাসগোতে। এসেই দেখা করেন ম্যাক্‌ভাইটির সঙ্গে, কারণ তার উপরেই আওয়েনের যা কিছু ভরসা। ম্যাক্‌ভাইটি এখানকারই লোক, এখানে তার যথেষ্ট সম্মান আছে, সে চেষ্টা করলে র‍্যাশলির সন্ধান পাওয়া কতকটা সম্ভব হতেও পারে।

আর চেষ্টা সে করবে বলেই আওয়েনের বিশ্বাস। কারণ চিরদিন সে অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির সঙ্গে ব্যবহার করে এসেছে একান্ত অনুগত বন্ধুর মত। অসওয়ালডিস্টোনের কোন কথায় প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, তাঁর সামান্য একটা পরামর্শকেও চিরদিন অলঙ্ঘ্য আদেশের মতই মর্যাদা দিয়েছে।

তাই বড় আশা নিয়ে আওয়েন গিয়ে দেখা করলেন ম্যাক্‌ভাইটির সঙ্গে। আর দেখা হওয়া মাত্র ম্যাক্‌ভাইটি তাঁকে অভ্যর্থনা করল যেন ঘরে তার পুজনীয় পাদরি সাহেব এসেছেন। কুশলপ্রশ্ন, মালিক অসওয়ালডিস্টোন কোথায় আছেন, কারবারের খবর কি, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান প্রশ্ন।

আওয়েন সবই খুলে বললেন। মালিকের হল্যাণ্ডে গমন, সেই সুযোগে বেইমান র‍্যাশলির লক্ষ পাউণ্ডের হুণ্ডি নিয়ে পলায়ন, নির্দিষ্ট দিনের ভিতর সেই সব হুণ্ডি উদ্ধার করতে না পারলে কোম্পানির ইজ্জত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ মালিক বিদেশে রয়েছেন, অন্য দিক্ থেকে অর্থ যোগাড় করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়—ইত্যাদি কোন কথাই গোপন করলেন না।

কিন্তু সব কথা খুলে বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌ভাইটির হাসিমাখা মুখের উপরে যে কালোমেঘ ঘনিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম আওয়েনের। ম্যাক্‌ভাইটি কোন জবাব না দিয়ে ছুটে গিয়ে তার হিসাবের বই খুলে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে হতাশভাবে চেঁচিয়ে উঠল—"কী সর্বনাশ! আপনাদের কাছে আমারও যে কয়েক হাজার পাউণ্ড পাওনা রয়েছে দেখছি!"

"হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে!" জবাব দিলেন আওয়েন—"সে পাওনাটাও তো ঐ হুণ্ডি থেকেই মেটানোর কথা!"

"সেই হুণ্ডি?" হুংকার করে উঠল ম্যাক্‌ভাইটি—"সেই হুণ্ডি আর আপনারা চোখে দেখতে পাবেন? র‍্যাশলি এতক্ষণ তা ভাঙানোর বন্দোবস্ত করে বসে আছে। তাকে খুঁজে বার করা? এক গাড়ি খড়ের ভিতর থেকে একটা সূঁচ খুঁজে বার করা বরং সম্ভব, কিন্তু

স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় আর জঙ্গলের ভিতর থেকে কোন পলাতক লোককে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। ও টাকা আপনাদের ডুবেছে, আর কোম্পানিও আপনাদের ডুবেছে। মাঝখান থেকে দেখছি, আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এ গরিবেরও কয়েক হাজার পাউণ্ড ডুবল। হায় হায়, এ ক্ষতি কি আমি সইতে পারব ?”

এর পর আওয়েনের কোন যুক্তি, কোন আবেদনই আর কানে তুলতে চাইল না ম্যাক্‌ভাইটি। অমায়িক ব্যবহারের আড়ালে কতখানি স্বার্থপরতা যে এতদিন লোকটা লুকিয়ে রেখেছিল, তা বুঝতে পেরে আওয়েনও হতভম্ব হয়ে রইলেন।

তারপরই সে এক খেল দেখিয়ে দিল। অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির প্রতিনিধি বলে আওয়েনের নামে সেই কয়েক হাজার পাউণ্ডের দরুন সে নালিশ ঠুকে দিল গ্লাসগোর আদালতে, আর দেনদারের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে—এই অজুহাত দেখিয়ে বিশেষ তদবিরের জোরে আওয়েনের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা বার করে ফেলল। আওয়েন এসবের বিন্দুবিসর্গ খবর পাননি, কাজেই আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাও করতে পারেননি।

“জেলে আসবার পরে কি কিছু করেছেন ব্যবস্থা ?” প্রশ্ন করে ফ্রাঙ্ক।

“আজ যে রবিবার ! আজ তো কোন কাজই হতে পারে না ! গ্লাসগোর উকিলেরা পর্যন্ত এত ধার্মিক যে রবিবারে উপাসনা ছাড়া আর কিছু করে না। তবে একটা কাজ আমি করেছি। তা সে করা না করা সমান।”

“কী সে কাজ ?” জানতে চায় ফ্রাঙ্ক হতাশভাবে।

“আমাদের আর একজন যে এজেন্ট আছে গ্লাসগোতে, মানে জার্ভির কথা বলছি, তাকে একখানা চিঠি লিখেছি আজ। কিন্তু চিরদিন তার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, অতিমাত্র হিসেবী আর হুঁশিয়ার লোক, কারও খাতির রেখে কথা কয় না—সে কি আর এই বিপদের সময়ে—হুঁঃ, ও চিঠি না লিখলেই বরং ভাল হত। খবর

পেয়ে সেও হয়ত আমার নামে আর এক নম্বর মামলা রুজু করে দেবে।”

এতক্ষণে সর্দারের কথা শোনা যায়। আওয়েনের কথার ভিতরে সে কথা কয়ে ওঠে—“কিংবা হয়ত মিস্টার ফ্রানসিসের নামেই—”

কথা বলবার সময়ে সর্দার এদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। এতক্ষণ ফ্রাঙ্ক তার মুখ কাপড়ে ঢাকাই দেখেছে, এইবার হঠাৎ সে মুখ দেখতে পেল অনাবৃত। আর দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—“মিস্টার ক্যাম্পবেল!”

“ক্যাম্পবেল নইলে কে আর আপনার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবে, নিজের ক্ষতি করে?” হেসে ফেলে সর্দার।

“কিন্তু আপনিই বা কিসের জন্যে··· ?”

“কারণ আছে বইকি! এমন একজনের অনুরোধ রয়েছে আপনার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবার জন্যে যে—”

“অনুরোধ? কার অনুরোধ?” অবাক্ হয় ফ্রাঙ্ক।

“নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন।” মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জবাব দেয় সর্দার।

হৃদয়ের দিকে? হঠাৎ ফ্রাঙ্কএর মনে পড়ে যায় ডায়নার কথা। ডায়নার সাথে ক্যাম্পবেল ওরফে ম্যাক্‌গ্রেগারের যোগাযোগ আছে, এ ইঙ্গিত সে ইঙ্গল্‌উডের কাছে থেকে পেয়েছিল। দু'জনেই ক্যাথলিক, দু'জনেই রাজা জেমসের অনুরাগী। তাঁকে ব্রিটেনের সিংহাসনে বসাবার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কিন্তু ও চিন্তার সময় নেই এখন। সমুখে বসে আওয়েন কারাবন্দী। যারা তাঁকে কয়েদ করেছে, তারা ফ্রাঙ্ককেও কয়েদ করবার চেষ্টা করবে। তাই তাকে রক্ষা করবার জন্যে ক্যাম্পবেল ওরফে ম্যাক্‌গ্রেগার···

হঠাৎ নীচের দরজায় ভয়ানক হৈ-হল্লা আর ধাক্কাধাক্কির সাড়া পাওয়া গেল।

ডুগাল ছুটে এসে দেখা দিল এক মুহূর্তের জন্যে—“জেলার সাহেব

ঢুকতে চাইছেন। সর্দার হুঁশিয়ার! কে জানত এত রাত্রে—হায়, হায়!"

এই বলেই সে আবার বেরিয়ে গেল নিজের ঘরে। গিয়ে জানালা খুলে কথা কইতে লাগল রাস্তার লোকদের সঙ্গে। সে লোকদের কোন কথা কানে এল না ফ্রাঙ্কদের। কিন্তু ক্যাম্পবেলের মুখে দেখা গেল একটা হিংস্র পরিবর্তন। তরোয়াল খানা দু'হাতে ধরে তিনি শক্ত হয়ে বসে আছেন—শত্রুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্যে একেবারে তৈরী হয়ে।

ফ্রাঙ্কই বুঝল—তার নিজের চাইতে ম্যাক্‌গ্রেগারের বিপদ শতগুণ বেশী। ধরা পড়লে প্রাণ যাবে সর্দারের। যাবে ফ্রাঙ্কের জন্যেই। সে কাতর হয়ে বলল—"কী হবে সর্দার?"

"দেখা যাক কি হয়।" গম্ভীরভাবে জবাব দিল সর্দার—"এর চাইতে বড় সংকটও এসেছে আমার জীবনে। সে সব সংকট কাটিয়েও উঠেছি।"

ওদিক্ থেকে ডুগালের কথা শোনা গেল—"ম্যাজিস্ট্রেট? এত রাতে?"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে জেলার এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে তিনখানা ঘর পেরিয়ে এতদূরেও স্পষ্ট শোনা গেল সে চীৎকার—"বেয়াদব কোথাকার! তোমায় কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? খোল দরজা!"

দরজা যে খুলতে হবে তা ডুগাল জানে। সে কেবল কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সময় কাটাচ্ছিল, যাতে ভিতরের ঘরে তার সর্দার মনস্থির করবার সময় পান।

দরজা অবশেষে খুলতেই হল, এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে জেলার নিজের বাসায় চলে গেলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঢুকলেন, প্রথমে ডুগালের ঘরে, তারপরে আওয়েনের ঘরে। ক্যাম্পবেল ঠিক করে রেখেছিলেন—ম্যাজিস্ট্রেটের ঢোকার সময় যেই দরজা খোলা হবে, অমনি আচমকা খোলা তরোয়াল নিয়ে

লাফিয়ে পড়ে, কেউ বাধা দেবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়বেন। বাইরে আছে ডুগাল, সে অবশ্য সদরটা খুলেই রাখবে তার জন্যে।

লাফিয়ে পড়তেও তিনি যাচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ঢুকতেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করে ফেললেন। একটা ক্ষীণ হাসির রেখা তাঁর ওষ্ঠে একবার দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে পিছন ফিরে আবার গম্ভীর হয়ে খাটিয়ায় বসে পড়লেন।

আওয়েনও ততক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে লক্ষ্য করেছেন, এবং তাঁকে দেখে তিনি বিস্ময় দমন করতে না পেরে বলে উঠলেন—"একি! মিস্টার জার্ভি? তবে না শুনলাম এক ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন?"

"হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেটই এসেছেন তো!" তেরিয়া হয়ে জবাব দিলেন জার্ভি—"মিস্টার জার্ভির বুঝি আর ম্যাজিস্ট্রেট হতে নেই? আমরা হচ্ছি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট। মাইনে নিইনে, কিন্তু ক্ষমতা রাখি। দেখছেন তো? ক্ষমতা না থাকলে আর রাত দুটোর সময় জেলখানার দরজা খুলিয়ে আপনাকে দেখতে আসতে পারি?"

আওয়েনের মুখে কথা নেই। বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! অসওয়াল-ডিস্টোনের এজেন্ট বলেই যে জার্ভিকে তাঁরা জানেন, তিনি তাহলে একজন জলজ্যান্ত ম্যাজিস্ট্রেট? তাইতো! এই জন্যেই এ লোকটার চিঠিপত্র অত কড়া!

দ্বিতীয়ত, সেই ম্যাজিস্ট্রেট যে এই রাত দুটোর সময়, বিছানা ছেড়ে, জেলারকে বিছানা থেকে টেনে তুলে আওয়েনকে দেখতে আসবেন—এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার দুনিয়ায় আর কী আছে?

আওয়েনের সন্দেহ হল, জার্ভিকে চিঠি লিখে তিনি হয়তো ভয়ানক ভুল করেছেন। লোকটা আগের দরুন ঝাল তো ঝাড়বেই আওয়েনের উপরে, তার চেয়েও বড় কথা, সে নিজেও অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির কাছে টাকা পাবে কিছু, আর তার দরুন হয়তো গুরুতর ঝামেলা কিছু বাধিয়ে দেবে।

জার্ভির সঙ্গে লোক ছিল, তাকে তিনি বললেন—"বাইরে গিয়ে

দরজায় পাহারা দাও। কেউ যেন এখান থেকে বেরিয়ে না যায়। এত রাত্রে যারা কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাদের পরিচয় না জেনে ছেড়ে দেওয়া হবে না।”

লোকগুলি বাইরে গেল; বাইরে থেকে তালা বন্ধ করল দরজায়। তখন জার্ভি আওয়েনের খাটিয়ায় বসে গম্ভীর হয়ে বললেন—“ব্যাপার কি, বলুন তো মিস্টার আওয়েন! আপনাকে এ অবস্থায় দেখব কোনদিন তা ভাবিনি। চিঠি সকাল বেলাতেই পেয়েছিলাম, কিন্তু জানেন তো, দিনটা রবিবার, বিষয়কর্ম রবিবারে একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি, বৈষয়িক বিষয়ের চিঠি পড়াও চলে না। তাই সারাদিন আপনার চিঠি পড়তে পারিনি। তারপর রাত বারোটা যখন বাজল, তখন পড়লাম চিঠি। কারণ রাত বারোটার পর আর তো রবিবার নেই, সোমবার পড়েছে।”

“চিঠি পড়েই অমনি চলে এলেন জেলখানায়?” ব্যাপারটা না বুঝলেও আওয়েন তাঁর কথায় একটা কৃতজ্ঞতার সুর ফোটাবার চেষ্টা করেন।

“উঁহুঃ, তক্ষুনি নয়!” ঘাড় নাড়েন জার্ভি, বলেন—“প্রথমে হিসাবের খাতাটা দেখলাম। আরে মশাই, আপনাদের কাছে আমারও যে মবলগ টাকা পাওনা! সেটাও কি ডুববে নাকি?”

এই রে! যেখানে নাকি বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হয়! জার্ভি ঠিক ম্যাক্‌ভাইটির সুরেই কথা কইছে। যাহোক্ তবু আওয়েন ক্ষীণ স্বরে আশ্বাস দেন—“ওই হুণ্ডি থেকেই সে টাকা শোধ করে দেব!”

“যাক, তবে আর চিন্তা নেই, কি বলেন?” বিদ্রূপ করে ওঠেন জার্ভি, তার পরেই কড়া সুরে বলেন—“ওই হুণ্ডি আবার ফিরে পাবার আশা করছেন নাকি? র‍্যাশলির হাত থেকে? বরং এক পাঁজা খড়ের ভিতর একটা সরু সূচ খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় জঙ্গলে যে লুকিয়েছে, তাকে কদাচ খুঁজে পাবেন না। ও আশা আপনিও ছাড়ুন, আমিও ছাড়ি। গেল এ দফায় কিছু অর্থ।

"একটা খাটো বন্দুক আঙরাখার ভিতর থেকে চট্ ক'রে বার করে
ফেল্‌লেন—ক্যাম্পবেল..."

তা আর করছি কী। আপনাদের সঙ্গে কারবার করে কিছু রোজগার করেছিলাম, কিছু আবার লোকসানও গেল। যিনি দেনেওয়ালা, তিনিই আবার লেনেওয়ালা। যাকগে ওকথা!

আওয়েন বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন। ফ্রাঙ্কও অবাক্ হতে শুরু করেছে। এ লোকটি যখন কথা বলতে শুরু করেছিল, তখন মনে হয়েছিল এ বুঝি ম্যাক্‌ভাইইটির সাক্ষাৎ মাসতুতো ভাই। কিন্তু শেষ করবার মুখে যে সুরে এ কথা কইল, এ যে দেবদূতের সুর!

জার্ভি কিন্তু থামেননি—"হ্যাঁ, লাভ লোকসানের কথা এখন থাকুক, আপাতত প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে এখান থেকে খালাস করা। আমি তো ম্যাজিস্ট্রেট, আমি আপনার নিজেরই জামিনে আপনাকে খালাস দিয়ে দেব কাল সকালেই। এখান থেকে বেরিয়েই আপনি চলে যাবেন আমার বাড়িতে, সেখানে গিয়ে প্রাতরাশ খাবেন আমার সঙ্গে। আর সেই সময় পরামর্শ করা যাবে, আপনার কোম্পানিকে বাঁচাবার জন্যে কী করা যায় না যায়।"

এই বলেই উঠে দাঁড়িয়ে হাকিমী গলায় জার্ভি বললেন—"এইবার দেখতে হচ্ছে শেষ রাতে জেলখানায় এসব কারা বাইরের লোক ঢুকেছে। আপনি কে মশাই?"

প্রশ্নটা ফ্রাঙ্ককে করা হয়েছে। আওয়েন তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—"ইনি মিস্টার ফ্রান্সিস অসওয়ালডিস্টোন, আমাদের মালিকের একমাত্র পুত্র। আমাদের বিপদের খবর পেয়ে—"

"আরে আরে, সেই কবি নাকি?" বলে জার্ভি ফ্রাঙ্কের হাত ধরে জোরে জোরে নাড়া দিলেন। বললেন—"কবিতার দিকে গিয়ে আপনি ভালই করেছেন। দেখুন ওদিক্ দিয়ে যদি দু'পয়সা রোজগার হয়। পৈতৃক ব্যবসাটি তো যাওয়ার দাখিল! তা পরিচয় যখন হল, তখন কাল সকালে আপনিও আসুন না আমার বাড়িতে, প্রাতরাশ খেতে। পরামর্শের ভিতর একজন কবি থাকা মন্দ নয়। হিসাব নিকাশের নীরস কথাবার্তায় তিনি হয়ত কিছু সরসতা আমদানি করতে পারবেন।

তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্পবেলের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, আর দাঁড়িয়েই এমন চমকে উঠলেন, যেন তিনি ভূত দেখেছেন।

ক্যাম্পবেল নীরব।

"আরে এ কী! এ কেমন ধাঁধা ব্যাপার? তুমি? অ্যাঁ? একি সত্যিই তুমি? হ্যাঁ হে ম্যাক্‌গ্রেগর, এ তুমি, না তোমার প্রেতাত্মা? তুমিই যদি হও, তাহলে কী সাহসে তুমি এখানে এলে? তুমি জানো না—তোমার মাথার জন্যে দশ হাজার পাউণ্ড ইনাম ঘোষিত হয়েছে?"

"তা হোক!" গম্ভীর হয়ে বলে ওঠেন ক্যাম্পবেল—"যেখানে আমার ভাই জার্ভি ম্যাজিস্ট্রেট, সেখানে ভয় কি আমার? এমন কিছু দূর সম্পর্কের ভাইও নয়। তোমার খুড়ীর মামাতো ভাইয়ের শ্বশুরের যে জ্ঞাতি ভাইপো এলেনবেরী, সে হল আবার আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ির—"

"থাক, থাক! হ্যাঁ, সম্পর্ক যে আছে তা আমি অস্বীকার করতে পারিনে।" বলেন জার্ভি—"আর পারিনে বলেই সেবার তোমায় হাজার পাউণ্ড ধার দিয়েছিলাম। কয় বছর হল হে? একটা ফুটো পেনীও তার ফেরত পেলাম না এ যাবৎ।"

"এবার পাবে। পরশু আমার বাড়িতে এসো তুমি। পুরো হাজার পাউণ্ডই এক সাথে পেয়ে যাবে।"

"পরশু? আরে, আজ তুমি সরকারী জেলখানা থেকে বেরুচ্ছ কি করে? বন্দুকধারী সান্ত্রীদের ফাঁকি দিয়ে?"

"কী করে বেরুচ্ছি?" হেসে জবাব দেয় সর্দার—"বেরুচ্ছি তোমার পিছনে পিছনে। ম্যাজিস্ট্রেটের ভাইকে কে আটকাবে?"

সত্যিই তাই! শেষ পর্যন্ত আটকাল না কেউই। জার্ভি নিজের লোকজন নিয়ে যখন বেরুলেন, তখন ভিড়ের ভিতর মিশে বেরিয়ে গেল ফ্রাঙ্ক আর সর্দারও। গোলমালের ভয়ে ডুগাল আগেই গা ঢাকা দিয়েছে। তবে বুদ্ধি করে দরজাটা রেখে গিয়েছে খুলেই।

"এবার ফয়েলের হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা হবে পরশু সন্ধ্যায়। হোটেলওয়ালা আমার বাধ্য লোক। ওখান থেকে আমিই সঙ্গে করে

তোমায় নিয়ে যাব আমার বাড়িতে।" এই কথা বলে সর্দার বিদায় নিল জার্ভির কাছে।

জার্ভির বাড়ি আর ফ্রাঙ্কের হোটেল একই রাস্তায়। নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়বার সময় জার্ভি বললেন—"কাল সকালের নেমতন্নটা ভুলো না অসওয়ালডিস্টোন। প্রাতরাশের টেবিলেই দেখতে পাবে মিস্টার আওয়েনকে।"

ফ্রাঙ্ক অশেষ ধন্যবাদ দিল জার্ভিকে। বাস্তবিক বিপদের সময়ে ছাড়া বোঝা যায় না যে কে সত্যিকার বন্ধু, আর কে নয়। এই জার্ভির সম্বন্ধে মোটেই ভাল ধারণা ছিল না ফ্রাঙ্কের বাবার। অথচ আজকার এই সংকটের মুহূর্তে ইনিই গ্লাসগোতে তাঁর একমাত্র বন্ধু। আর যাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন, সেই ম্যাক্‌ভাইটি? সে মুখোশ খুলে ফেলে শত্রুর পর্যায়ে নেমে দাঁড়িয়েছে, সামান্য কিছু অর্থ মারা যাওয়ার আশঙ্কায়।

জার্ভির কাছে বিদায় নিয়ে সেই শেষ রাত্রে গ্লাসগোর রাস্তা ধরে একা চলেছে ফ্রাঙ্ক। যতদূর ধারণা তার আছে, হোটেল খুব বেশী দূরে হবে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়েই চলেছে। হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল, তিনটি লোক হেঁটে যাচ্ছে পাশাপাশি, যেন গভীরভাবে কোন গোপন বিষয়ের আলোচনা করতে করতেই চলেছে।

খুব বেশী পিছনে ফ্রাঙ্ক নয়। রাস্তায় ভাল আলো থাকলে ওদের মূর্তিগুলো স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ত। কিন্তু তা না পড়লেও, মাঝের লোকটির চেহারা অস্পষ্টভাবে এবং পিছন থেকে দেখেই ফ্রাঙ্ক চমকে উঠল। এ র‍্যাশলি না হয়ে যায় না! যাকে খুঁজে বার করা এক গাড়ি খড়ের ভিতর থেকে ছোট্ট সূচটি আবিষ্কার করার চেয়ে শক্ত বলে বলছে সবাই, সে তো ঐ তার সমুখেই! চোরাই হুণ্ডি ওর কাছ থেকে আদায় করার এ সুযোগ কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারে না ফ্রাঙ্ক। সে মরিয়া হয়ে ওদের পিছনে চলল।

যেতে যেতে অন্য লোক দুটোকেও আস্তে আস্তে চিনতে পারল সে। একটা ম্যাক্‌ভাইটি, আর একটা মরিস। এদের দু'জনেরই

সঙ্গে তাহলে যোগাযোগ আছে র‍্যাশলির? তাই বটে! একে একে অনেক ঘটনার কথাই মনে পড়ে ফ্রাঙ্কের। জবসন যেদিন তাকে বন্দি করে, সেদিন ইঙ্গলউডের বাড়িতে গিয়েই যে লোকটিকে দেখতে পাওয়া যায়, সে হল র‍্যাশলি। ফ্রাঙ্কের নামে নালিশটা করেছিল মরিসই, কিন্তু তার পক্ষ থেকে মামলার তদবির করছিল র‍্যাশলি। জবসন তো স্পষ্টই বলেছিল—একজন জমিদারের ছেলের কথার উপর নির্ভর করেই ফ্রাঙ্ককে গ্রেফতার করতে সে সাহস পেয়েছে! বাহাদুর র‍্যাশলি! নিজে ডাকাতি করে নিজেই আবার মরিসের পক্ষে তদবির করে বেড়িয়েছে!

তারপর র‍্যাশলি ইঙ্গলউডের বাড়ি থেকে বেরুলো তার বাবাকে ডেকে আনবার জন্যে। কিন্তু মোটেই তা আনেনি। খালাস পাওয়ার পরে ফ্রাঙ্ক বাড়ি এসে জানতে পেরেছিল যে র‍্যাশলি মোটেই সার হিলডিব্রাণ্ডের কাছে ফ্রাঙ্কের গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারটা জানায়নি। অবশ্য ফ্রাঙ্ক তখন আর এ নিয়ে কোন কথা তোলেনি, তবে সন্দেহ তার তখনই হয়েছিল র‍্যাশলির উপরে।

সে সব সন্দেহ যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ আজ পাওয়া গেল। ঐ তো মরিস আর র‍্যাশলি গলাগলি ধরে চলেছে পরম বন্ধুর মত!

সঙ্গে আছে ম্যাক্‌ভাইটিও। নিশ্চয়ই র‍্যাশলির কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়েই ম্যাক্‌ভাইটি আওয়েনকে জেলে পুরেছে। নিশ্চয়ই ম্যাকভাইটি আশা পেয়েছে যে তার পাওনাগুলো র‍্যাশলিই মিটিয়ে দেবে। স্বার্থের খাতিরে ছাড়া এক পাও যে এগুবে না ম্যাক্‌ভাইটি, তা ফ্রাঙ্ক বোঝে।

কিছু দূর এই ভাবে চলল তারা, আগে আগে ওরা তিনজন, পিছনে একা ফ্রাঙ্ক। ফ্রাঙ্ক সুযোগের অপেক্ষা করছে, কতক্ষণে র‍্যাশলিকে একা পাওয়া যাবে।

সে সুযোগ এল। মরিস আর ম্যাক্‌ভাইটি অন্য রাস্তা ধরল, পথে রইল একা র‍্যাশলি! এইবার দৌড়ে গিয়ে ফ্রাঙ্ক ধরল র‍্যাশলিকে।

পিছন থেকে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে ডাকল—"দাঁড়াও হে, অনেক খোঁজাখুঁজি করছি তোমাকে।"

চমকে ফিরে দাঁড়াল র‍্যাশলি, ফ্রাঙ্ককে দেখেই তার মুখ কালো হয়ে গেল।

"অনেক খোঁজাখুঁজি করেছ? আহাহা, কবিতা লেখায় বড়ই বাধা হয়েছে তো তাহলে!" নাক সিঁটকে উপহাস করে র‍্যাশলি।

"হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না র‍্যাশলি! হুণ্ডিগুলো ফেরত দিতে হবে তোমাকে।"

"হুণ্ডিগুলো? কিসের হুণ্ডি?" ঝেড়ে অস্বীকার করে দুর্বৃত্ত।

"কিসের হুণ্ডি? আমার বাবার কারবারের হুণ্ডি, যা চুরি করে তুমি পালিয়ে এসেছ লণ্ডন থেকে!" কড়া সুরে জবাব দেয় ফ্রাঙ্ক।

"কারবারের হুণ্ডি, আমিও কারবারেরই কর্মচারী। আমি যদি হুণ্ডি এনেই থাকি, তা চুরি হবে কেন? আর তার জন্যে আমি এমন লোকের কাছে জবাবদিহিই বা করতে যাব কেন, যে কারবারের কেউ নয়, যে বলতে গেলে, পিতার ত্যাজ্যপুত্র?"

"তুমি যদি ভাল কথায় হুণ্ডি ফেরত না দাও, আমি তোমায় বাধ্য করতে জানি।" এই বলে র‍্যাশলির মুখে এক ঘুষি মারল ফ্রাঙ্ক।

র‍্যাশলির দু'চোখ দিয়ে আগুন বেরুলো যেন এক ঝলক। দাঁত কিড়মিড় করে সে বলল—"এ অপমানের সাজা ভদ্রসমাজে শুধু একটাই আছে। এর জন্যে জান দিতে হবে তোমাকে।"

"হয় আমাকে, নয় তোমাকে—চল আমি প্রস্তুত। তোমায় মেরে না ফেলে কাগজগুলি যে আমি উদ্ধার করতে পারব না, তা আমি বুঝেছি।"

"মেরে ফেললেও পারবে না।" বলে র‍্যাশলি রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথ ধরে। খানিকটা গিয়েই একটা নিভৃত জায়গায় এসে পৌঁছায় ওরা। একদিকে নদী, সেইখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হলে যদি একজন মারাই-

যায়, তাহলে মৃতদেহটা নদীতে টেনে ফেলে দিয়ে অন্যজন হাত ধুয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াল তরোয়াল খুলে। ফ্রাঙ্ক গোড়াতেই লক্ষ্য করল যে, র‍্যাশলির তরোয়াল যেন অস্বাভাবিক রকম লম্বা। সাধারণত ভদ্রলোকেরা যে জাতীয় তরোয়াল সঙ্গে রাখে, তার চেয়ে এর দৈর্ঘ্য অন্তত ছয় ইঞ্চি বেশী। এথেকে এইটেই বোঝা যায় যে, যে কোন মুহূর্তে লড়াইবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়তে হতে পারে বলে র‍্যাশলি আগে থাকতেই অনুমান করে নিয়েছে, এবং তৈরীও হয়ে আছে সেজন্যে।

কিন্তু তরোয়াল খাটো হলেও তরোয়াল খেলাতে ফ্রাঙ্ক ওস্তাদ। র‍্যাশলি দুই এক জায়গায় তাকে অল্প স্বল্প আঘাত করল বটে, কিন্তু ফ্রাঙ্ক ধীরে ধীরে ততক্ষণে কাছে ঘনিয়ে এসেছে আততায়ীর। এইবার, আবার আঘাত করবার জন্য যেই র‍্যাশলি তরোয়াল তুলেছে, অমনি ফ্রাঙ্ক একেবারে তরোয়াল হেনেছে তার বুক লক্ষ্য করে।

আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই র‍্যাশলির মৃতদেহ মাঠে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু তা আর ঘটতে পারল না! দু'জনের অজান্তেই আর একটা লোক যে একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তা কেউই টের পায়নি। টের যখন পেল, তখন তার চওড়া খাঁড়ার এক আঘাতে ফ্রাঙ্ক আর র‍্যাশলির দু'জনেরই অস্ত্র ছিটকে পড়েছে তাদের হাত থেকে।

আগন্তুক বলে উঠল—"ছিঃ ছিঃ! ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ? আমরা হাইল্যাণ্ডারেরা চল্লিশ পুরুষ তফাতের সুবাদ থাকলেও লোককে ভাই বলে কোল দিই, আর তোমরা কিনা সাক্ষাৎ খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই হয়ে খুনোখুনি করতে বসেছ? ছিঃ ছিঃ!"

অবাক্ হয়ে ফ্রাঙ্ক দেখল, লোকটি আর কেউ নয়, সেই ক্যাম্পবেল বা ম্যাক্‌গ্রেগর সর্দার। সে ক্যাম্পবেলের তিরস্কার গায়ে না মেখে বলল—"ওকে হত্যা না করে তো আমি হুণ্ডিগুলো উদ্ধার করতে পারব না!"

র‍্যাশলিও যে ক্যাম্পবেলকে ভাল ভাবে চেনে, তার অকাট্য প্রমাণ আজ হাতে হাতে পেল ফ্রাঙ্ক। যুদ্ধের নেশার ঝোঁকে বিচারবুদ্ধি ও সতর্কতা হারিয়ে ফেলেছে র‍্যাশলি—সে ক্যাম্পবেলকে লক্ষ্য করেই বলে উঠল—"তুমি তো জানো সর্দার, ওকেও জেলে পুরবার জন্যে মরিস গ্লাসগোর আদালতে নালিশ করেছে। ও কোথায় লুকিয়ে বেড়াবে তা নয়, শহরের বুকে দাঁড়িয়ে তরোয়ালবাজি করছে!"

ক্যাম্পবেল যা বলল এর উত্তরে, তাতে ফ্রাঙ্কের চোখ ছানাবড়া। বললে—"আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ র‍্যাশলি! মরিস নালিশ করেছে বলে একটা সাহসী যুবা পুরুষ লুকিয়ে বেড়াবে? এমন কথা তুমি ভাবতে পার, কিন্তু আমি তা পারি না। আর সে নালিশ তো ডাহা মিথ্যে নালিশ। আসলে মরিসের সোনা লুঠ যারা করেছিল—সে তো তুমি আর আমি! সে দোষ নিরপরাধ বেচারার ঘাড়ে চাপানো কি উচিত? উচিত নয় বলেই একবার আমি ইঙ্গলউডের বাড়ি থেকে এ ভদ্রলোককে খালাস করে আনি, দরকার হলে গ্লাসগোর আদালত থেকেও আনব।"

ফ্রাঙ্কের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল এইজন্যে যে, ক্যাম্পবেলের কথা থেকে সে এইটি আজ নিশ্চিত জানতে পারল যে অসওয়ালডিস্টোন নামক যে দ্বিতীয় দস্যুটি ক্যাম্পবেলের সঙ্গে সেদিন মরিসের উপর চড়াও হয়েছিল, সে র‍্যাশলি স্বয়ং।

কী জঘন্য মনোবৃত্তি তার এই খুড়তুতো ভাইটির! ডাকাতি করতে দ্বিধা করেনি, তার পর আবার ডাকাত বলে ধরিয়ে দিয়েছে এমন একজনকে যে নির্দোষ তো বটেই, তার উপর সম্পর্কে তার ভাই! এ সবের চাইতেও বড় কথা, একদিন যার টাকা লুঠ করেছিল, আজ পরম বন্ধু সেজে তারই সঙ্গে গলাগলি করে বেড়াচ্ছে, আর মতলব আঁটছে নতুন নতুন বদমাশির।

ফ্রাঙ্ক যখন এইসব ভাবছে, র‍্যাশলি কী যেন সব কথা কইছে তখন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ফিসফিস করে। অবশেষে এক সময় সে সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল, আর অমনি তার পথ রোধ

করে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। বললে—"আমার হুণ্ডি ফেরত না দিয়ে এক পাও নড়তে পারবে না এখান থেকে।"

এবার তাকে বাধা দিলেন ক্যাম্পবেল—"হুণ্ডি এখন ওর কাছে নেই, ও আর তুমি পাবে না। অকারণ কেন কাটাকাটি করে মরবে দু'জনে? তার চেয়ে অন্য উপায়ের কথা ভাবলে হয়ত কাজ দেবে।"

ক্যাম্পবেলের পিছন দিয়ে র‍্যাশলি পালাল, ফ্রাঙ্ক এদিকে পড়ল হতাশ হয়ে; বললে—"অন্য উপায়? অন্য কী উপায়? দিন যে ফুরিয়ে এল! আর অল্প কয়েকটা দিন পরেই অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানি দেউলে বলে প্রচার হয়ে যাবে সারা দেশে, আর তুমি আমায় বলছ র‍্যাশলিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য উপায় খুঁজতে? কী অন্য উপায় আছে আমার?"

বলতে বলতে সহসা ফ্রাঙ্কের একটা কথা মনে হল। ডায়না ভারনন একখানা চিঠি দিয়েছিল তার হাতে। কার নামে চিঠি তাও সে জানে না। ডায়না বলে দিয়েছিল—সব উপায় যখন ব্যর্থ হবে, তখন এই চিঠিখানা ব্যবহার করতে। এ চিঠি ব্যবহার করবার সময় তো তাহলে এসেছে! এতদিন ভরসা ছিল র‍্যাশলিকে খুঁজে বার করতে পারলেই হুণ্ডি পাওয়া যাবে। আজ তো র‍্যাশলিকে পাওয়া গিয়েছিল, কায়দাও করা গিয়েছিল, কিন্তু ক্যাম্পবেল যে বললেন র‍্যাশলির কাছে হুণ্ডি নেই! তবে! আর কি কোনও উপায় আছে তার হাতে?

না নেই! সুতরাং ডায়নার চিঠি কাজে লাগে কিনা, তা দেখবার সময় এসে গিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি জামার ভিতরের পকেটে হাত দিয়ে চিঠিখানা বার করে ফেলল, আর উপরের সাদা খামটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শিরোনামের দিকে তাকাল। তারপরই সে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

"কী হল আবার?" জিজ্ঞাসা করলেন ক্যাম্পবেল।

"এ যে আপনার নামেই লেখা!" জবাব দিল ফ্রাঙ্ক।

"আমার নামে?" হাত বাড়ালেন সর্দার। তার পর চিঠি নিয়ে

তার শিরোনামটি পড়ে ফেললেন—"রবার্ট ম্যাক্গ্রেগর ক্যাম্পবেল—হ্যাঁ, ঠিক আছে! দেখি কে লিখল চিঠি, আর কী লিখল আমাকে।"

চিঠি পড়তে পড়তে নানা অদ্ভুত ভাবের ছায়া খেলতে লাগল সর্দারের মুখে। প্রথমে কৌতুক, তারপর উদ্বেগ, পরে বিরক্তি। পড়া শেষ করে তিনি টকটক শব্দ করলেন মুখ দিয়ে—আফসোসের আওয়াজ, তারপর বললেন—"দেখ গেরো! একটা দিন আগে যদি ব্যাপারটা জানতে পারতাম! মেয়েদের ব্যাপারই এইরকম। আগে থাকতে আমায় বললে কী হত? 'ফ্রাঙ্কের উপর নজর রেখো'—এটা বলতে পারল, আর 'ফ্রাঙ্কের হুণ্ডিগুলো উদ্ধার করে দিও'—এটা বলতে আটকাল তার?"

"মিস্ ভারনন তো জানতেন না যে আমার বাবার হুণ্ডি চুরি করে র‍্যাশলি পালিয়েছে! জানার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখেছেন!" ডায়নার হয়ে ফ্রাঙ্কই কৈফিয়ত দেয়।

"কিন্তু অন্য সব উপায় ব্যর্থ হলে তবে আমার হাতে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা কেন? সময়ে এই চিঠি পেলে—"

এই বলে দারুণ বিরক্তির সঙ্গে সর্দার দাঁতে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে ফ্রাঙ্ককে বললেন—"যা হবার হয়ে গিয়েছে—পরশু জার্ভি আসছে আমার হাইল্যাণ্ডের বাড়িতে, আপনিও আসুন তার সঙ্গে। আমি দেখি কী করে আপনার কাগজ আবার র‍্যাশলির হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। একটিমাত্র লোকের দ্বারাই সে কাজ করানো সম্ভব। তাঁকে এখন ধরতে পারলে হয়। অথচ মজা এই, তাঁকে মিস্ ভারনন নিজেই বলতে পারতেন, আমাকে এই চিঠি না লিখে। বলতে সাহস পাননি আর কি!"

ফ্রাঙ্ক চমকে ওঠে—কাকে বলতে পারতো ডায়না, অথচ সাহস পায়নি?

"তিনি কি পাদরি ভগান?" সংকোচের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে ক্যাম্পবেলকে।

এ কথার জবাব না দিয়ে ক্যাম্পবেল শুধু হাসেন। তবে হাসির

ধরনটা দেখে ফ্রাঙ্কের বুঝতে বাকী থাকে না যে ভগানের কথাই সর্দার বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায়, বিদায়ের রাত্রে বাগান থেকে সে অসওয়ালডিস্টোন হলের পিছন থেকে জানালায় দুটি লোকের ছায়া দেখতে পেয়েছিল। একটি ছায়া যে ডায়নার, তা সে চিনেছিল। চিনতে পারেনি দ্বিতীয়টিকে।

সেটি তাহলে ভগানেরই ছায়া? আফসোসে ফ্রাঙ্কও টকটক শব্দ করে জিভে তালুতে মিলিয়ে। সাহস পেলে ডায়না যে কথা তক্ষুনি বলতে পারত, আজ সেই কথা বলবার জন্যে ক্যাম্পবেলকে পাহাড়ের কোন্ দুর্গম কোণে ছুটতে হবে, তা কে জানে!

কেন ভগানকে এত ভয় ডায়নার? ডায়না তো সহজে ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়!

কিন্তু ক্যাম্পবেল বিদায় নিচ্ছেন; বললেন—"পরশু যেতে যেন ভুল না হয়। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব এর মধ্যে যাতে হুণ্ডিগুলো ফেরত আসে। ডায়নার অনুরোধ আমি নিশ্চয়ই রাখব। অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না।"

ফ্রাঙ্ককে আর কথা কইতে না দিয়ে ক্যাম্পবেল হনহনিয়ে মাঠ পেরিয়ে চললেন। ফ্রাঙ্কের হোটেল অন্য দিকে, সে সেই দিকেই হাঁটল।

পরদিন সকালে জার্ভির বাড়িতে যেতেই আওয়েনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ফ্রাঙ্কের। ম্যাজিস্ট্রেট নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন —রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িয়ে এনেছেন আওয়েনকে।

খেতে খেতে অনেক কিছুই আলোচনা হল অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানির ব্যাপার নিয়ে। ফ্রাঙ্ক বর্ণনা করল—র‍্যাশলির সঙ্গে তার দেখা আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হওয়ার সমস্ত ঘটনা। পরিশেষে বলল—কী করে হঠাৎ মাঝখানে আবির্ভূত হয়ে ক্যাম্পবেল সর্দার যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর ফ্রাঙ্ককে বলেছেন জার্ভির সঙ্গে হাইল্যাণ্ডের পাহাড়ে যেতে।

হুণ্ডি হাইল্যাণ্ডে পৌঁছেছে? আওয়েন হতাশ হয়ে পড়ল। বিপ্লব-

ভাণ্ডারে ছলে-বলে-কৌশলে অর্থ সঞ্চয় করছে এরা—রাজা জেমসের অনুরাগীরা। অতি শীঘ্রই যে একটা গৃহযুদ্ধ বাধবে, এটা সকলেরই অনুমান। জেমসের পৈতৃক সিংহাসনে জেমসকে বসাবার জন্যে স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা একটা শেষ চেষ্টা করবে। এদেশে লর্ড বোশাম্প হচ্ছেন জেমসের প্রতিনিধি। তিনি আর কেউ নন—সার ফ্রেডারিক ভারনন, ডায়নার বাবা। তিনি কোথায় থাকেন, কখন কোথায় যান, কেউ খবর জানে না। তবু একথা সবাই জানে যে সারা স্কটল্যাণ্ডে, বিশেষত হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে লর্ড বোশাম্পের অসংখ্য চর আছে। তারা সৈন্য আর অর্থ যোগাড় করে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরছে প্রাণটা হাতে করে। রাজা জর্জের সৈন্যদের হাতে পড়লে তাদের সেই মুহূর্তেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, তার বিচারও নেই, আচারও নেই।

সে যা হোক, জার্ভি পরামর্শ দিলেন—যাওয়াই উচিত ফ্রাঙ্কের। হুণ্ডি উদ্ধার কেউ যদি করতে পারে, তবে সে ক্যাম্পবেলই। এবং তিনি যখন নিজে নিমন্ত্রণ করেছেন ফ্রাঙ্ককে, তখন না গেলে তাঁকে অপমান করা হবে। এই সব পাহাড়িয়া সর্দারদের মর্যাদাবোধ অতি প্রখর, কিসে যে তাঁদের মান যায়, তা অন্য লোকে বোঝে না।

একজন সঙ্গী পেলে জার্ভিরও লাভ। কথায় বার্তায় আনন্দে পথ চলা যায়। তাছাড়া পথঘাট নিরাপদও নয়। সাধারণ অবস্থাতেই চুরিচামারি এদিক্‌টায় লেগেই আছে, এখন তো প্রায় যুদ্ধের অবস্থা।

ঠিক হল পরদিন ভোরবেলায় রওনা হওয়া যাবে। ফ্রাঙ্ক আসবে জার্ভির বাড়িতে নিজের চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে সবাই এক সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে পাহাড়ের অভিমুখে।

তার পর আওয়েনকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রাঙ্ক নিজের হোটেলে এল। ঐ হোটেলেই একটা অতিরিক্ত ঘর ভাড়া নেওয়া হল আওয়েনের জন্য। ফ্রাঙ্ক হাইল্যাণ্ড থেকে না ফেরা পর্যন্ত আওয়েন সেই ঘরেই থাকবেন।

এণ্ড্রুকে হুকুম দিল ফ্রাঙ্ক—পরদিন সকালে সে যেন তৈরী থাকে হাইল্যাণ্ডের দিকে রওনা হওয়ার জন্যে।

পাঁচ

পাহাড় অঞ্চলের শুরুতেই এবারফয়েলের গ্রামখানি। দূরে দূরে কয়েক ঘর গরিব পাহাড়িয়ার ক্ষুদে ক্ষুদে পাথরের কুঁড়ে, তাদের জীবিকার উপায় যে কী, তা কেউ জানে না। তারা নিজেরা বলে—গরু ঘোড়া কেনাবেচা; কিন্তু পুলিস সন্দেহ করে—চুরি ডাকাতি। কারণ কেনাবেচার ব্যবসা করতে মূলধন লাগে, তা ওরা পাবে কোথায়?

গ্রামে ঢুকতেই পাওয়া যায় একটি হোটেল, তার মালিক এক আধবুড়ী রমণী। সে আদর করেই গ্রহণ করল জার্ভি আর ফ্রাঙ্ককে। সঙ্গে চাকরবাকরও আছে তাঁদের। আজকার রাতটা অন্তত থাকবেন এখানে, কারণ ক্যাম্পবেল এখানে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কথা আছে।

ক্যাম্পবেলের নাম করতেই হোটেলওয়ালী ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠল, ঠিক ডুগালের মতই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল—"ওঃ, ম্যাক্‌গ্রেগর, তিনি তো আমাদের সর্দার, আমাদের রাজা!" তারপরই নিজেকে সংযত করে নিয়ে জার্ভিকে বলল—"তবে কি জানেন হুজুর, পুলিসের বা সৈনিকদের কাছে আমি স্বীকার করিনে যে ম্যাক্‌গ্রেগরের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ওরা তো আজকাল হামেশাই আসছে কিনা! লড়াই তো বাধতে যাচ্ছে!"

হোটেলওয়ালীর কথা যে সত্যি, তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল, একদল সেপাই এসে হাজির হল হোটেলে। জার্ভি আর ফ্রাঙ্ক তখন খাওয়ার ঘরে ছিলেন, সেপাইদের মেজর এসে সেইখানেই একটা টেবিল দখল করলেন। সেপাইরা গেল রান্নাঘরে, তারা সেখানেই খাবে।

মেজরটির নাম গলব্রেইথ। খাস স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি, এবং মনে মনে নির্বাসিত রাজা জেমসের ভক্ত। কিন্তু বাইরে মনের ভাব কখনও প্রকাশ করেন না, কারণ তা করলে চাকরি তো থাকবেই না, জীবনও যেতে পারে। সাবধানে মনের কথা মনেই চেপে রাখেন, তবে পেটে মদ পড়লে তা আর চাপা সম্ভব হয় না।

সুযোগ পেলে মদটা একটু বেশীই খান মেজর সাহেব। আজকের এই সুযোগও তিনি ছাড়লেন না, হোটেলওয়ালীর উপর হুকুম করে বোতলের পর বোতল আনাতে লাগলেন টেবিলে।

মনের কথাও ক্রমশঃ বেরিয়ে আসতে লাগল। আলাপ শুরু করলেন নিজের পরিচয় দিয়ে এবং জার্ভিদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। জার্ভি গ্লাসগোর ম্যাজিস্ট্রেট, দেনদারের কাছে টাকা আদায় করতে পাহাড়ের ভিতরে চলেছেন শুনে হুঁশিয়ার করে দিলেন তাঁকে—"জানেন তো, দিন কাল খারাপ। একটা লড়াই বাধবে বলেই মালুম হচ্ছে। হাইল্যাণ্ডের লোকেরা তো মারমুখো হয়েই আছে। এ সময়ে ওরা কি টাকা দেবে আপনাকে? মানে, যদিও আপনি ম্যাজিস্ট্রেট, তাহলেও আইনের মান তো ওরা থোড়াই রাখে কিনা! ওরা যা মানে, সে হচ্ছে বন্দুকের গুলি।"

জার্ভি আর ফ্রাঙ্ক মনে মনে অসোয়াস্তি বোধ করছেন। হোটেল-ভরতি সৈনিক, ম্যাক্‌গ্রেগর এ সময়ে এসে পড়লে তো ভারী বিপদের কথা! ও যে ফেরারী দস্যু, ওর মাথার উপরে যে দশ হাজার পাউণ্ডের হুলিয়া ঝুলছে, তা কি এই পল্টনের একটা লোকও জানে না? অবশ্যই কেউ না কেউ জানে, এবং এদের ভেতর কেউ না কেউ ম্যাক্‌গ্রেগরকে চিনবেই, তখন কি হবে?

গলব্রেইথ ক্রমাগত মদ খাচ্ছেন, আর ক্রমাগত বকে যাচ্ছেন। এবার তিনি বলতে শুরু করেছেন—"জানেন ম্যাজিস্ট্রেট মশাই, এ অঞ্চলের সেরা ডাকু যে ম্যাক্‌গ্রেগর, সে এই ধারে কাছেই আছে। আর্জিলের ডিউক আমাকে পাঠালেন তারই খোঁজ করবার জন্যে। আমি তো মশাই, তাকে পেলেও ধরব না। লোকটা ভাল।

আর্জিলের ডিউক আমার উপরওয়ালা হলে কি হবে, তাঁর হুকুমেও আমি ম্যাক্‌গ্রেগরকে ফাঁসিতে ঝোলাব না। রাজা জেমসের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক, আর ঐ ম্যাক্‌গ্রেগরও স্কটল্যাণ্ডের লোক, আবার আমিও স্কটল্যাণ্ডেরই লোক। আর্জিলও তো তাই, কিন্তু উচ্চাশায় ওকে খেয়েছে! ও এখন ইংরেজ রাজার তাঁবেদারি করে আরও উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করছে।"

ফ্রাঙ্ক নিজে ইংরেজ, ইংরেজ রাজার উপর এরকম তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ তার ভাল লাগল না, সে বলল—"ইংরেজ রাজা তো এখন স্কটল্যাণ্ডেরও রাজা! দুটো দেশ তো এখন এক হয়ে গিয়েছে।"

"সে শুধু কাগজে কলমে দাদা, সে শুধু কাগজে কলমে!" উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন গলব্রেইথ—"তেলের সঙ্গে জল যেমন মেশে না, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডও তেমনি মিশবে না। একবার রাজা জেমসের জাহাজ ক্লাইডের মোহানায় এসে নোঙ্গর ফেলুক না; তখন দেখবেন কত ধানে কত চাল।"

জার্ভি তাঁকে বাধা দিলেন—"এ সব আপনি কী বলেছেন? আপনি তো রাজা জেমসের সৈনিক নন, রাজা জর্জের সৈনিক!"

"সৈনিক যারই হই, দু'জনকেই আমি ভক্তি করি, কারণ দু'জনই রাজা। একজন ন্যায়তঃ রাজা, আর একজন কার্যতঃ রাজা।" এই অদ্ভুত মতবাদ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে গলব্রেইথ কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বাইরে যেন আর একদল সৈনিকের গোলমাল শোনা যায়।

সত্যিই তাই। আর একদল সৈনিকই বটে, এবং এরা ইংরেজ সৈনিক, আপাতত গ্লাসগো থেকে এলেও, এরা স্থায়ী ভাবে সেখানে থাকে না, থাকে খাস ইংল্যাণ্ডে। যুদ্ধ আসন্ন মনে করে দলে দলে ইংরেজ সৈন্যকেও স্কটল্যাণ্ড পাহারা দেবার জন্যে পাঠানো হয়েছে, এরা সেই সৈন্যদলেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ। এদের নায়ক হয়ে এসেছেন এক যুবক, ক্যাপ্তেন থর্নটন।

থর্নটন তো গলব্রেইথের মাতাল অবস্থা দেখে প্রথমেই তাকে এক হাত নিলেন—"দুরন্ত দস্যু ম্যাক্‌গ্রেগর যখন ধারে কাছেই দল

পাকাচ্ছে, তখন আপনি কী বিবেচনায় বসে বসে মদ গিলছেন? তাকে ধরতে না পারলে দুদিনের ভিতরই গোটা হাইল্যাণ্ডটাই একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে, তা কি আপনি জানেন না?"

"আপনি কি ম্যাক্‌গ্রেগরকে ধরতে এসেছেন?" প্রশ্ন করেন গলব্রেইথ—"বলে, হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল। যদি নিজের ভাল চান, ও মতলব ছেড়ে দিয়ে আমার পাশে টেবিলে বসে যান। তাতে আর কিছু না হোক, জানটা বাঁচবে।"

"জানের উপর অত মায়া থাকলে পল্টনে ঢুকতাম না" এই বলে থর্নটন জার্ভি আর ফ্রাঙ্কের পরিচয় জানতে চাইলেন। এবং পরিচয় পেয়েও গলব্রেইথের মত খুশী হতে পারলেন না। বললেন—"শুধু ম্যাক্‌গ্রেগর নয়, আরও দুটি লোককে ধরবার ভার আমার উপর আছে। অবশ্য তারা দু'জনেই স্কচ, আর এঁদের এক জন পরিচয় দিচ্ছেন ইংরেজ বলে। কিন্তু বয়স মিলে যাচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছে—সেই দু'জনের একজন হলেন প্রৌঢ়, আর একজন তরুণ। এঁদের ভিতরও একজন প্রৌঢ়, আর একজন তরুণকে দেখতে পাচ্ছি। তরুণটি সত্যিই ইংরেজ না স্কচ, তা কে বলবে? অনেক স্কচও সুন্দর ইংরেজী বলে। যা হোক, মহাশয়রা, আপনাদের আমি গ্রেফতার করছি আপাতত। যদি আপনারা আসল লোক না হন, কালই মুক্তি পেয়ে যাবেন। একটা রাত নজরবন্দী থাকলে কী আর ক্ষতি আপনাদের?"

জার্ভি রেগে আগুন একেবারে। তিনি একটা ম্যাজিস্ট্রেট লোক, তাঁকে গ্রেফতার করা? তিনি ভয় দেখালেন—গ্লাসগোয় ফিরে গিয়ে থর্নটনকে তিনি রীতিমত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন এই অভদ্রতার জন্যে। কিন্তু থর্নটন ভয় পাওয়ার লোক নন। তিনি দুইজন সৈনিককে ডাকলেন, বন্দীদের পাহারায় থাকবার জন্যে।

ঠিক সেই সময়ে বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল—অনেক লোকের দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি, ধমকাধমকি। সঙ্গে সঙ্গেই একটা সৈনিক ছুটে এসে খবর দিল—"কাপ্তেন! এক গুপ্তচর ধরা পড়েছে,

জানালায় দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনছিল। আমরা দেখতে পেয়ে তাড়া করতেই অ্যায়সা দৌড় লাগিয়েছিল—কিন্তু আমরা তাকে ধরে ফেলেছি শেষ পর্যন্ত।"

সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজনে মিলে টেনে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে এল বন্দী গুপ্তচরকে। জার্ভি আর ফ্রাঙ্ক তাকে দেখেই চমকে উঠলেন—এ যে সেই ডুগাল! গ্লাসগোর দেওয়ানী জেলের পাহারাওয়ালা!

থর্নটন ধমকাতে শুরু করলেন ডুগালকে—"জানিস, গুপ্তচরের কী সাজা? তোকে এক্ষুনি ফাঁসি দেব।"

ডুগাল কেঁদে ভাসিয়ে দিল—"আমি গুপ্তচর নই হুজুর!"

"গুপ্তচর নই!" খেঁকিয়ে ওঠেন থর্নটন—"গুপ্তচর না হলে তুই এই রাতের বেলায় সরাইখানার জানালায় উঁকি দিচ্ছিস কেন?"

"পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছি, পকেটে একটি পেনী নেই, হোটেলওয়ালীর কাছে কেঁদে ককিয়ে এক রাতের জন্যে আশ্রয় চেয়ে নেব বলে!" তড়িঘড়ি জবাব দেয় ডুগাল।

"পথ ভুলে এসে পড়েছিস্? হাইল্যাণ্ডার কখনও পথ ভোলে? তুই যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, আমার কথার সাফ সাফ জবাব দে।" হুংকার করেন থর্নটন।

ডুগাল জবাব দেয় না।

"আমার কথাটা বুঝতে পারছিস তো? জবাব যদি না দিস বা মিথ্যে জবাব দিচ্ছিস বলে যদি বুঝতে পারি, ঐ বাইরে লম্বা লম্বা গাছ দেখছিস, ওর সব চেয়ে কাছের গাছটাতে লটকে দেব তোকে।"

মুখ গোমড়া করে ডুগাল বলে—"বলুন—"

"তোদের সর্দার কোথায়? ম্যাক্গ্রেগর?"

"তার বাড়িতে বোধ হয়!"

"কোথায় তার বাড়ি?"

"আমি কেমন করে জানব? আমি জন্ম থেকে গ্লাসগোতে মানুষ, পাহাড়ের ভিতর জন্মে ঢুকিনি হুজুর!"

"নাঃ, এর কাছ থেকে কথা বেরুবে না। কে আছ? লোকটাকে

"টের যখন পেল, তখন তার চওড়া খাঁড়ার আঘাতে ক্যাঙ্ক আর র‍্যাশলীর—
দু'জনারই অস্ত্র ছিটকে পড়েছে তাদের হাত থেকে।"

নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দাও ঐ গাছে।" সরাসরি হুকুম এলো থর্নটনের।

বাইরে থেকে দু'জন খাকিপরা সৈনিক এসে অমনি চেপে ধরল ডুগালকে, ঘাড় ধরে ঠেলে নিয়ে চলল তাকে বাইরের দিকে।

"দাঁড়ান! দাঁড়ান! আমি বলছি সব কথা!" প্রাণের ভয়ে কেঁদে ওঠে ডুগাল। থর্নটন হেসে বলেন—"এতক্ষণে ধড়ে বুদ্ধি এসেছে।"

ডুগালকে এনে আবার কাপ্তেনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল সেপাইরা। প্রশ্ন হল—"তুই গুপ্তচর, এটা স্বীকার করছিস কিনা, আগে বল।"

"হ্যাঁ হুজুর, গুপ্তচর বইকি!"

"কী করতে এসেছিলি এখানে?"

"এ হোটেলে কত সেপাই আছে, খোঁজ নিতে।"

"নিয়ে গিয়ে কী করবি?"

"সর্দারকে বলব, সে শেষ রাতে এসে হানা দেবে এখানে।"

"সর্দার আছে কোথায়? তার বাড়িতে?"

"না, সে যে কোন্ জায়গা, তা মুখে বলে আমি বোঝাব কেমন করে? পাহাড়িয়া পাকদণ্ডী বেয়ে সেখানে যেতে হয়। আপনারা সে পথে কখনই চলতে পারবেন না। আমাদেরই অন্তত তিন চার ঘণ্টা লাগে যেতে।"

"কত লোক এখন আছে সর্দারের সঙ্গে?"

"সঙ্গে? সঙ্গে পাঁচ-সাতজনের বেশী নেই, তবে কাছাকাছি অনেক আছে, এক ঘণ্টার ভিতর পাঁচশো লোক সে জমায়েত করতে পারে।"

"সে একঘণ্টা সময় তাকে দেব না। তুই এখনই আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে পারবি? যেখানে পাঁচ-সাতজন মাত্র লোক নিয়ে সে অপেক্ষা করছে তোর জন্যে?"

ডুগাল আবার চুপ মেরে যায়। বার বার প্রশ্নেও থর্নটন তার গোমড়া মুখ থেকে জবাব বার করতে পারেন না।

সৈনিকেরা ইতিমধ্যে বুনো লতা পাকিয়ে শক্ত ফাঁস তৈরি করে ফেলেছে। থর্নটনের ইঙ্গিতে তারা এসে ডুগালের গলায় সেটা পরিয়ে দেয়, আর লতা ধরে টানতে থাকে। চট্ করে ফাঁস আটকে যায় তার গলায়, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

"যাও, লটকে দাও। এ অতি বেয়াড়া লোক, গোঁ ছাড়বে না কিছুতেই যখন—"

লতা ধরে সৈনিকেরা টানতে লাগল। এ লতা অতি শক্ত, সত্যি সত্যিই মানুষ ফাঁসি দেওয়ার জন্যে ডাকাতেরা এ লতা ব্যবহার করত স্কটল্যাণ্ডে।

হাঁইফাঁই করতে করতে ডুগাল বলে—"ছাড়ুন হুজুর, ছাড়ুন যাব আমি।"

ফাঁস আলগা করে দেয় সৈনিকেরা। থর্নটন বলেন—"ওই লতার ফাঁস তোর গলাতেই থাকবে, আর লতার প্রান্ত ধরে ধরে তোর পিছনে পিছনে চলবে একজন সৈনিক। বেইমানি করবার চেষ্টা করেছ কি আমি একটি ইশারা করব, আর লতার ফাঁস আটকে যাবে গলায়।"

"না, বেইমানি করব না হুজুর! আপনি বাঁচলে তবে তো সর্দার!"

থর্নটনের আদেশে সৈন্যেরা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হল। গলব্রেইথের সৈন্যরা আগেই চলে গিয়েছে, থর্নটনের কাছে বিদায় না নিয়েই। তারা থাকলে দলে একটু ভারী হওয়া যেত। থর্নটনের নিজের দলে তো মাত্র চৌদ্দজন সেপাই!

তবু থর্নটনের ভয় বা দ্বিধা নেই। এঁদের হাতে ভাল বন্দুক আছে, আর ম্যাক্‌গ্রেগরের সঙ্গে পাঁচ সাতজনের বেশী দস্যু নেই। আচমকা হানা দিতে পারলে তাকে বন্দী করতে না পারার কোন কারণই নেই। তার পাঁচশো সঙ্গী খবর পাওয়ার আগেই সর্দারকে বেঁধে নিয়ে থর্নটন এবারফয়েলে এসে পৌঁছোতে পারবেন আবার।

থর্নটন এইবার জার্ভিকে বললেন—"আপনাদেরও আমি সঙ্গে

নিয়ে যাব। সরকারের এক আদেশ পালন করতে গিয়ে অন্য আদেশ আমি অবহেলা করতে পারি না। আমার উপর হুকুম আছে—এক মধ্যবয়সী ও এক তরুণকে এদিকে কোথাও এক সাথে দেখতে পেলেই গ্রেফতার করতে হবে। গ্রেফতার আমি করেছি, সুতরাং গ্লাসগোতে সরকারী কর্তাদের সমুখে আপনাদের হাজির করতে যতক্ষণ না পারছি, ততক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই রাখতে হবে আপনাদের, এতে কোন আপত্তিই চলবে না।"

জার্ভি আবারও শাসালেন—"গ্লাসগোতে চল একবার, তোমার এ ব্যবহারের কেমন পুরস্কার তুমি পাও, দেখবে তখন।"

কিন্তু কোন শাসানিই গ্রাহ্য করেন না থর্নটন। সৈন্যদের মাঝখানে জার্ভি, ফ্রাঙ্ক, এণ্ড্রু ও জার্ভির ভৃত্য দু'জনকে রেখে তিনি গোটা দলটাকে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। ঘোড়ার পিঠেই সবাই চলেছে অবশ্য।

কিন্তু ঘোড়া নিয়ে খুব বেশী দূর যাওয়া চলল না। পাহাড়ে এমন খাড়া খাড়া চড়াই আর উতরাই দেখা যেতে লাগল যে ঘোড়া পথের পাশে বেঁধে রেখে সৈনিকদের পায়দলে এগুনো ছাড়া আর উপায় রইল না।

একটা হ্রদের তীর ধরে সবাই চলেছে। রাস্তা আঁকাবাঁকা তো বটেই, উঁচু নীচুও। পাঁচ হাত সামনে বা দু'হাত ডাইনে বাঁয়ে কী আছে, বুঝবার উপায় নেই। থর্নটনের বুঝতে বাকী রইল না যে এপথে কোথাও যদি ম্যাক্‌গ্রেগর লুকিয়ে থেকে থাকে, এবং রাজসৈন্যের আগমনের কথা যদি আগে থাকতে সে জানতে পেরে থাকে, তবে হঠাৎ ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে সে এই চৌদ্দটা সৈনিককে পাঁচ মিনিটের ভিতরেই কুপোকাত করতে পারবে। তার জন্যে পাঁচ-সাতটা লোকই যথেষ্ট, বেশির দরকার নেই।

ডুগালকে মাঝে মাঝেই তিনি ধমকাচ্ছেন—"ঠিক পথে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিস তো? কোন বেইমানির আভাস পেলেই ফাঁসের দড়িতে টান পড়বে, তা মনে রাখিস।"

ডুগাল গোমড়ামুখে জবাব দেয়—"ম্যাক্‌গ্রেগর কি আপনার সুবিধের জন্যে এমন জায়গায় এসে বসে থাকবে, যেখানে আপনি আরাম করে দুলতে দুলতে এসে তার হাতে হাতকড়ি পরাতে পারবেন ? ডাকাতেরা এই রকম দুর্গম জায়গাতেই থাকে। বিশেষ করে যখন রাজার পল্টন তাদের ধরবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরতে শুরু করে।"

একথার পরে থর্নটনকে বাধ্য হয়েই চুপ করতে হয়। ডুগালের কথা তো ঠিকই। সব চেয়ে দুর্গম স্থানেই তো দস্যুদের থাকবার কথা।

কিন্তু তা বলে এমন দুর্গম ? এ যে পা ফেলাই শক্ত হয়ে উঠছে। বাঁয়ে আকাশছোঁয়া খাড়া পাহাড়, ডাইনে অতল খদ, মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। অতি সাবধানে এক একজন করে এগিয়ে চলেছে থর্নটনের লোকেরা। ঠিক এমনি সময়ে সামনে দেখা দিল এক মাঝারি আকারের টিলা, তার গা বেয়ে উঠতে হবে। সে চড়াইও প্রায় খাড়া, চার হাত-পা দিয়ে হামা দিতে দিতে কোনমতে ওঠা যেতে পারে। টিলার ওধারে কী আছে—কিছু দেখবার উপায় নেই।

থর্নটনের এবার সত্যিই ভয় হল। এ জায়গায় যদি ম্যাক্‌গ্রেগর ওত পেতে থাকে, তবে একটি প্রাণীও আজ জ্যান্ত ফিরতে পারবে না। কিন্তু সাহস দিচ্ছে ডুগাল—"এই টিলাটা পেরুলেই একটা গুহা আছে পাহাড়ের গায়ে—সেইখানে আছে ম্যাক্‌গ্রেগর।"

থর্নটনের উবে যাওয়া সাহস আবার ফিরে এল। তিনি সৈন্যদের এগিয়ে যেতেই বললেন। চার হাত-পা দিয়ে পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে এক একজন করে লোক উঠতে লাগল টিলা বেয়ে।

"গুড়ুম !" হঠাৎ বন্দুকের শব্দ।

মাথা তুলে সবাই দেখতে পেল—টিলার মাথায় একদল লোক যেন ভোজবাজির বলে হঠাৎ এসে দেখা দিয়েছে। অবশ্য দল বলতে পাঁচ-সাত জনেরই একটা দল। আর সে দলের ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে

যাকে সে একটি রমণী। খুব লম্বা চওড়া চেহারা হলেও বেশ বোঝা যায় যে সে একটি রমণী।

পুরোদস্তুর সামরিক সাজপোশাক পরে হাতে বল্লম ধনুক আর কোমরে তলোয়ার নিয়ে এই রমণী নিজের দলের লোক কয়টিকে বলছে—"একটা গুলিও যেন না ফসকায়। ম্যাক্‌গ্রেগরের দেশে এসেছে অনেক সাধ-আহ্লাদ করে, উপযুক্ত সমাদর কর এমনভাবে—জীবনেও যেন ওরা তা আর না ভোলে।"

"গুড়ুম, গুড়ুম গুম,!" একসঙ্গে পাঁচটা বন্দুকের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। থর্নটনের সৈনিকেরা প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেলেও মাথা ঠিক করে আত্মরক্ষার চেষ্টা শুরু করেছে ততক্ষণে। কিন্তু টিলার গা এমন খাড়া যে সেখানে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারে না, তা বন্দুক ছুঁড়বে কেমন করে?

চৌদ্দজন সৈনিকের সাত-আটজন ঘায়েল হওয়ার পরে থর্নটন দেখলেন এখান থেকে পালানোও যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব টিলার মাথায় চড়ে শত্রুদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করা। তিনি নিজেও বেশ আহত; অকারণে বাকী কয়েকজন সৈন্যের মৃত্যুর কারণ হয়ে লাভ কী? তিনি চেঁচিয়ে বললেন—"গুলি কোরো না, আমরা আত্মসমর্পণ করছি।"

এদিকে জার্ভি, ফ্রাঙ্ক আর তাঁদের অনুচরেরা লড়াই শুরু হতেই পিছনে সরে এসেছেন। থর্নটনই সরিয়ে দিয়েছেন এদের। টিলার নীচেই খদ, কী ভাগ্যি সেই খদের গায়ে সেখানে কিছু কিছু ঝোপঝাড় ছিল, এরা গিয়ে সেইসব আঁকড়ে ধরে আছে। জার্ভি তো তিনশূন্যে ঝুলছেন, তাঁর জামাটা আটকে গিয়েছে এক কাঁটা গাছের ডালে, তা নইলে কোন্‌কালে তিনি পড়ে যেতেন খদের অতল গহ্বরে।

কিন্তু ডুগাল?

টিলায় চার হাত-পায়ে হামা দিয়ে উঠবার সময় তার গলার লতা আর কেউ ধরে রাখতে পারেনি। সেও উঠছিল অন্যদের মত স্বাধীন-ভাবে। টিলার মাথায় প্রথম বন্দুকের আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

যেই সবাই চমকে উপর পানে তাকিয়েছে, সে দিয়েছে খদের ভিতর লাফ। তারপর থেকেই সে অদৃশ্য।

সে যে গোড়া থেকে মতলব করে থর্নটনের দলকে এই বিপাকের ভিতর এনে ফেলেছে, তাতে থর্নটনের আর সন্দেহ নেই। এবারফয়েলের হোটেলে গিয়ে ইচ্ছে করেই সে ধরা দিয়েছে। ম্যাক্‌গ্রেগরের আস্তানা দেখিয়ে দিতে তার যে সেই অনিচ্ছার অভিনয়—সে শুধু থর্নটনের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে। বলামাত্রই যদি সে রাজী হয়ে যেত তাহলে সৈনিকদের মনেও সন্দেহ আসত যে সে হয়ত ম্যাক্‌গ্রেগরকে ধরিয়ে না দিয়ে সৈনিকদেরই ধরিয়ে দিতে চাইছে।

যা হোক, থর্নটন আত্মসমর্পণ করে নিজেদের বন্দুক মাটিতে রেখে দিলেন। আর হাইল্যাণ্ডাররা এসে একে একে শক্ত করে বেঁধে ফেলল সবাইকে। তারপর তাদের টিলার উপরে টেনে তুলে, আবার নীচে নেমে এল জার্ভির দলকে উদ্ধার করবার জন্যে। জার্ভিকে দোদুল্য অবস্থা থেকে নামিয়ে আনা মোটেই সহজ হল না। শেষকালে উপর থেকে দড়ি ফেলে পেঁচিয়ে তাঁকে টেনে তোলা হল। উপরে উঠে এসেই তিনি ফ্রাঙ্ককে বললেন—"ভাগ্যিস জামাটা শক্ত কাপড়ের ছিল। নইলে নরম-সরম শৌখিন কাপড় হলে কি আর আমার দেহের ভার বইতে পারে? ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে যেত, আর আমিও ঘ্যাচ করে খদের তলায় নেমে যেতাম।"

তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন দস্যুনেত্রীর দিকে—"বৌদিদি, আমায় চিনতে পারছ তো? আমি গ্লাসগোর জার্ভি। ম্যাক্‌গ্রেগরের মাত্র সাতপুরুষ তফাতের ভাই। তোমায় আগেও অনেকবার দেখেছি। দেখেছ তুমিও আমাকে, কেন যে চিনতে পারছ না—"

দস্যুনেত্রী অর্থাৎ ম্যাক্‌গ্রেগরের স্ত্রী হেলেন রেগে আগুন হয়ে উঠল—"বিপদে পড়লে শহুরে নবাবেরাও পাহাড়ের ভিখারীদের ভাই বলে কবুল করে। আমার মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গিয়েছে, তা শোনোনি? ভাইই যদি হবে, তখন তবে ছিলে কোথায়?"

দস্যুদের ডেকে হেলেন হুকুম দিল—"এদেরও বাঁধ। ম্যাক্গ্রেগর এলে তখন এদের সাজার ব্যবস্থা করা যাবে।"

এইবার ফ্রাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল—"আমরা আপনার হাতে পড়েছি, যা কিছু সাজা আপনি ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন আমাদের। কিন্তু তাতে অতিথির উপর অত্যাচার করা হবে। ম্যাজিস্ট্রেট জার্ভি আর আমি দু'জনেই এবারফয়েলে এসেছিলাম আপনার স্বামীর নিমন্ত্রণে। কথা ছিল—তিনি নিজে সেখানে গিয়ে আমাদের নিয়ে আসবেন তাঁর নিজের বাড়িতে। দুর্ভাগ্য আমাদের তিনি সেখানে গেলেন না, এল এই সৈন্যেরা। এরা আমাদের বন্দী করেই এনেছে, তা এই ক্যাপটেনকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।"

হেলেন ম্যাক্গ্রেগরের রাগ তাতেও পড়ে না। রণরঙ্গিণীর মুখ থেকে হয়ত কঠোর একটা আদেশই বেরুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল দূরের একটা বাজনার আওয়াজের দিকে। শুধু সেই নয়, উপস্থিত সকলেই সেদিক পানে ঘুরে দাঁড়াল।

ব্যাগপাইপ বাজছে পাহাড়ের ওধারে কোথায়। টিলার মাথা থেকে হয়ত বাদকদের দেখতেও পাওয়া যেত, যদি না পাহাড়তলির এই অংশটা আচ্ছন্ন থাকত ঘন অরণ্যে। শত্রু মিত্র সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সেই বাজনা। এ বাজনা কি রাজসৈন্যের কোন দলের? থর্নটন না জানুন, হেলেন ম্যাক্গ্রেগর জানে যে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে আর্জিলের ডিউকের সৈন্যেরা প্রবেশ করেছে। মেজর গলব্রেইথের মত অনেক সেনানায়ক খুঁজে বেড়াচ্ছে দুরন্ত দস্যু ম্যাক্গ্রেগরকে।

ম্যাক্গ্রেগর দস্যুতা করছে বহুকাল থেকে। এযাবৎ তাকে ধরবার জন্যে এমন ব্যাপক আয়োজন হয়নি। কিন্তু এখন হঠাৎ হচ্ছে কেন?

খুব সংগত কারণ আছে। গভর্নমেণ্ট জানে যে নির্বাসিত রাজা জেমস্‌এর পক্ষে যে বিদ্রোহ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে ম্যাক্গ্রেগরের আছে একটা উঁচু দরের ভূমিকা। ধরতে গেলে সে এই

আসন্ন গৃহযুদ্ধে জেমস্ রাজার একটা বড় সহায়। হাইল্যাণ্ড অঞ্চলের বিভিন্ন পাহাড়িয়া উপজাতিকে সংগঠিত করে জেমস্‌এর পতাকার নীচে একত্র করার ব্যাপারে নেতৃত্ব নিয়েছে ম্যাক্‌গ্রেগরই। তাকে সময় থাকতে যদি পাকড়ানো যায়, জেমস্ অন্তত হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে বিশেষ সমর্থন পাবেন না।

ব্যাগপাইপের বাজনা ক্রমে নিকটে আসছে। না, রাজসৈন্য নয়; ওই যে পতাকা দেখা যাচ্ছে। ও পতাকা ম্যাক্‌গ্রেগরেরই।

কিন্তু এ আবার কী? ব্যাগপাইপে তো আনন্দের সুর বাজছে না! একটা করুণ রোদন যেন উপচে পড়ছে ওই বাজনা থেকে। এর মানে কী? পাহাড়িয়াদের মুখে চোখে ভয় আর উৎকণ্ঠার আভাস দেখা দিল। হেলেন টিলা থেকে নেমে ছুটে যেতে চায় যেন! তার স্বামী, তার পুত্রেরা—সব কুশলে আছে তো?

তাই যদি থাকবে, তাহলে এ করুণ সুর বাজে কেন?

ওই এল তারা! একদল হাইল্যাণ্ডার। এদের বেশভূষা ভাল, অস্ত্রশস্ত্র নতুন, চকচকে। কিন্তু হাঁটছে সবাই বিষণ্ণভাবে মাথা নীচু করে। আগে আগে দুই-তরুণ যুবক। এরা রব ম্যাক্‌গ্রেগরের দুই ছেলে—হ্যামিশ আর রবার্ট, একজনের বয়স কুড়ি, আর একজনের আঠারো।

ফ্রাঙ্ক দেখে অবাক্ হল, ওদের সঙ্গে একজন বন্দী রয়েছে। সে বন্দী আর কেউ নয়—সেই হতভাগ্য মরিস, যে অকারণে বহু হয়রান করেছে ফ্রাঙ্ককে।

হ্যামিশ আর রবার্ট ততক্ষণে এগিয়ে এসে মায়ের সমুখে নতমুখে দাঁড়িয়েছে। মুখে তাদের কথা নেই। চোখেও বুঝি তাদের জল।

হেলেন ধৈর্য ধরতে পারে না, চিৎকার করে ওঠে, প্রায় কান্নার মত সে চিৎকার—"হ্যামিশ, রবার্ট, তোদের বাবা কই? ম্যাক্‌গ্রেগর কই?"

"তিনি বন্দী!" অতি ক্ষীণ স্বর শোনা যায় হ্যামিশের মুখ থেকে।

"ব—ন্দী ? ম্যাক্‌গ্রেগর ?" অবিশ্বাসের সুর শোনা যায় হেক্টেনের প্রশ্নে—"যুদ্ধ করে ম্যাক্‌গ্রেগরকে বন্দী করবে, এমন বীর কে আছে এদেশে ? আর তিনি যদি বন্দী হলেন, তবে তোরা বেঁচে ফিরে এলি কেন ? জীবন দিয়ে পিতাকে রক্ষা করতে পারলি না ? এ তোরা কেমন ধারা ছেলে !"

হ্যামিশ ধীরে ধীরে বলে—"আগে সব শোনো মা ! আমাদের আগে থাকতেই অপরাধী কোরো না। যুদ্ধ যদি হত, তাহলে ম্যাক্‌গ্রেগরকে বন্দী করতে কেউ পারত না, বা পারলেও সে খবর তোমাকে শোনাবার জন্যে হ্যামিশ আর রবার্ট কখনও ফিরে আসত না। যুদ্ধে পিতা বন্দী হননি। হয়েছেন ছলনায়, বিশ্বাসঘাতকতায়। ঐ নারকী মরিস—"

গর্জন করে উঠল সবগুলো হাইল্যাণ্ডার একপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। মরিসের দিকে তাদের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

"ঐ মরিসই এর মূল।" বলে ওঠে হ্যামিশ।

অনেকবার থেমে, অনেকের অনেক প্রশ্নের বাধা কাটিয়ে কাটিয়ে হ্যামিশ তার মায়ের কাছে যে বিবরণ দাখিল করল, তা এই—

এবারফয়েলে ইংরেজ সৈন্য আসছে—গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ জানতে পেরে ম্যাক্‌গ্রেগর নিজে সেখানে যাওয়ার কল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ডুগালকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে সে দলবল নিয়ে এই টিলাতেই আসবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় তার কাছে আসে এই মরিস।

মরিস ইংরেজ সরকারের কর্মচারী। ডিউক অব আর্জিলএর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে বলে ফেলে যে ম্যাক্‌গ্রেগর সর্দারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অমনি ডিউক তাকে পেয়ে বসেন। তিনি বলেন—নিভৃত আলোচনার জন্যে ম্যাক্‌গ্রেগরকে তাঁর কাছে ডেকে আনতে। বলেন যে একটা আপস রফা করাই নাকি তাঁর উদ্দেশ্য।

মরিস ডিউকএর কথা ঠেলতে পারে না। ম্যাক্‌গ্রেগরের কাছে এসে তাঁর প্রস্তাব জানায়। প্রথমে সে প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দেন

ম্যাকগ্রেগর, কিন্তু মরিস যখন বলে যে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে মরিস নিজেই দায়ী হয়ে হাইল্যাণ্ডার শিবিরে বসে থাকবে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত—তখন ম্যাক্‌গ্রেগরের সন্দেহ দূর হয়। তিনি মরিসকে হ্যামিশদের জিম্মায় রেখে নিজে ডিউকএর সঙ্গে দেখা করতে যান।

ডিউক তাঁকে নিজের হাতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ বন্দী করেন। প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের জন্যে নিজে ধিক্কৃত হবেন, মরিস বেচারা হয়ত প্রাণ হারাবে তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে—এসব চিন্তা তাঁকে একটুও কাতর করতে পারে না। ম্যাক্‌গ্রেগর বন্দী এবং নিহত হলে বিদ্রোহের মূলই উৎপাটিত হবে, রাজা জর্জ আর্জিলকে আগের চেয়েও সম্মানিত করবেন—এই লোভেই তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন একেবারে।

খবর জানতে বাকী রইল না হ্যামিশদের। বিশ হাজার সেনা রয়েছে আর্জিলএর শিবিরে। সেখানে হানা দিয়ে পিতাকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব নয় বলেই ওরা এসেছে মায়ের আদেশ নেবার জন্যে।

আদেশ? সে পরে হবে। উপস্থিত প্রতিহিংসা।

মরিস যে এ ব্যাপারে নির্দোষ, এটা বিশ্বাসই হয় না হেলেনের। সে তক্ষুনি আদেশ দিল মরিসকে মেরে ফেলতে।

হতভাগ্য মরিসের সে কী কাতরতা! কেঁদে সে লুটিয়ে পড়ল হেলেনের পায়ে। ভগবানকে সাক্ষী করে বলতে লাগল আর্জিলের বেইমানিতে তার কোন অংশ নেই। সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে অত বড় একটা লোক এভাবে কথার খেলাপ করবে।

কিন্তু হেলেন অটল। তার হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়া। তার আদেশ লঙ্ঘন করা হাইল্যাণ্ডারদের সাধ্য নেই, প্রবৃত্তিও তাদের সেরকম নয়। তাদের সর্দার বন্দী হয়েছে, প্রাণও তার নিশ্চয় যাবে, এ অবস্থায় স্বভাবতঃ হিংস্র পাহাড়িয়ারা প্রতিহিংসার জন্যে ক্ষেপে উঠবে বইকি!

হেলেনের আদেশে তারা মরিসকে টানতে টানতে হ্রদের ধারে নিয়ে গেল। একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে তার দু'হাত পিছমোড়া করে

বেঁধে ফেলল, তারপর তার গলায় একটুকরো খুব ভারী পাথর বেঁধে সেই টিলা থেকে তাকে গভীর জলে নিক্ষেপ করল।

আকাশে উঠল একটা করুণ হাহাকার, জলে উঠল একটা ঢেউ আর কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌, তারপর সব ঠাণ্ডা।

হেলেনের ক্রোধের আগুন তখনও নেবেনি। সে এবার আগুন-চোখে জার্ভি আর ফ্রাঙ্কএর দিকে তাকাল। উদ্দেশ্য তাদেরও হ্রদের জলে ফেলে দেওয়া। কিন্তু তাদের রক্ষা করল ডুগাল। সে হ্রদের ভিতর লাফিয়ে পড়েছিল। উঠে এসেছে কোনমতে জীবন নিয়ে। সে বারবার জানাল যে এরা সর্দারের সম্মানিত অতিথি। তাঁর বিশেষ নিমন্ত্রণ পেয়েই এরা এসেছে সর্দারের বাড়িতে।

হেলেন তবু ইতস্ততঃ করে। অবশেষে বলে—"বেশ, এরা যদি সত্যিই সর্দারের বন্ধু হয়, তবে এদের ভিতর একজন আর্জিলএর ডিউকএর কাছে যাক আমার দূত হয়ে, গিয়ে বলুক যে ম্যাক্‌গ্রেগরের একগাছি কেশ যদি স্পর্শ করা হয়, তাহলে থর্নটন আর তার সৈন্যদের তো প্রাণ যাবেই, সমস্ত হাইল্যাণ্ডে এমন আগুন জ্বলবে যে তার ভিতর থেকে প্রাণ নিয়ে স্বয়ং আর্জিলও বেরুতে পারবেন না।"

প্রৌঢ় জার্ভি তখন এত ক্লান্ত যে এক পা চলবারও তাঁর সাধ্য নেই। দৌত্যের ভার কাজেই ফ্রাঙ্কের উপরই পড়ল। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এণ্ডরু, এইটেই হল হেলেনের আদেশ। তবে এণ্ডরু আর্জিলের শিবিরে ঢুকবে না, দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই বনের ভিতর লুকিয়ে পড়বে।

জার্ভির কাছে বিদায় নিয়ে ফ্রাঙ্ক আবার যাত্রা করল পাহাড়ের দুর্গম পথে। বহু পাহাড় ডিঙিয়ে, বহু অরণ্য পেরিয়ে সকালবেলায় এসে হাজির হল আর্জিলএর শিবিরে।

পাহাড়ে ঘেরা একটা উপত্যকায় আর্জিল শিবির স্থাপন করে বসে আছেন। দুর্ধর্ষ দস্যু ম্যাক্‌গ্রেগরকে বন্দী করেছেন, মনে আজ তাঁর আর আনন্দ ধরে না। মেজর গলব্রেইথ ও অন্যান্য সেনানায়কদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করছেন খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে, এমন সময়

পাহাড়ের উপর থেকে দু'হাত তুলে ফ্রাঙ্ক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন সৈনিক পাঠিয়ে তখনই সেনাপতি তাকে নিজের কাছে আনালেন।

প্রথমে ফ্রাঙ্ক দিল নিজের পরিচয়। বলল যে মিস্টার জার্ভি নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসছিলেন নিজের কাজে পাহাড় অঞ্চলে। পাহাড় দেখবার জন্যে সেও তাঁর সঙ্গ নেয়। এবারফয়েলে সে বন্দী হয় কাপ্তেন থর্নটনের হাতে।

এইখানে মেজর গলব্রেইথ তার কথার সমর্থন করলেন। তিনি বললেন যে গতরাত্রে এবারফয়েলে তিনি এই যুবককে ও মিস্টার জার্ভিকে দেখেছিলেন। সার ফ্রেডারিক ভারনন ও পুরুষবেশী তাঁর কন্যা এই অঞ্চলে আছেন জেনে সরকার থর্নটনকে আদেশ দিয়েছেন তাঁদের ধরতে। ভুলক্রমে থর্নটন জার্ভি আর এই যুবককেই বন্দী করেছিলেন।

তারপর ফ্রাঙ্ক নিবেদন করল যে কেমন করে তারা বন্দী হয় থর্নটনের হাতে, কেমন করে গুপ্তচর সেজে ডুগাল এসে থর্নটনকে লোভ দেখিয়ে পাহাড়ের ভিতর নিয়ে যায়, কেমন করে থর্নটন তাকে ও জার্ভিকেও টেনে নিয়ে যান সঙ্গে করে, কেমন করে হেলেন ম্যাক্‌গ্রেগর পাঁচটি মাত্র পাহাড়িয়া নিয়ে থর্নটনকে আহত ও বন্দী করেছে, কেমন করে সে হত্যা করেছে মরিসকে এবং ভয় দেখিয়েছে থর্নটনকে আর তাঁর সব কয়টি সৈনিককে হত্যা করবার, এবং অবশেষে—

বাধা দিয়ে আর্জিল বললেন—"তোমাকে পাঠিয়েছে আমাকে বলবার জন্যে যে ম্যাক্‌গ্রেগরকে হত্যা করলে সে আমাকেও ফাঁসিতে লটকাবে, কেমন?" এই বলে তিনি উচ্চহাস্য করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি সেনানায়কও হাসলেন, সেনাপতির সুরে সুর মিলিয়ে।

হাসলেন না কেবল গলব্রেইথ। তিনি বরং গম্ভীর হয়ে বললেন— "ম্যাক্‌গ্রেগরকে বধ করলে সারা হাইল্যাণ্ডে যে আগুন জ্বলবে তা

ঠিক। আমরা এখন হাইল্যাণ্ডের ঠিক মাঝখানে রয়েছি। এখানে সৈন্যবল বিশেষ কাজে লাগে না। রইলই বা আমাদের বিশহাজার সৈন্য, তারা এখানে ঘুরবে ফিরবে কোথায়? শুনলেন তো, পাঁচটা পাহাড়িয়া নিয়ে একটা স্ত্রীলোক চোদ্দজন শিক্ষিত রাজসৈন্যকে হতাহত করেছে, বেঁধে রেখেছে। আমি তো মনে করি, চোদ্দজন না হয়ে চুয়ান্নজন হলেও তারা ওই একই ভাবে হতাহত আর বন্দী হত।"

বিরক্ত হয়ে আর্জিল বললেন—"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে ম্যাক্‌গ্রেগরকে ছেড়ে দেব?"

"ছেড়ে দিতে বলিনি। তাকে যদি সাজা দিতে হয়, তাহলে আগে এই সৈন্যদলটাকে পাহাড়ের ভিতর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। শেষে হয়ত আর সরানো সম্ভব হবে না।"

আর্জিল মনে মনে এ কথাটার সারবত্তা স্বীকার করলেন। কিন্তু তখুনি এর কোন জবাব না দিয়ে ফিরে তাকালেন ফ্রাঙ্কের দিকে—"যুবক! তুমি ফিরে গিয়ে ম্যাক্‌গ্রেগরের স্ত্রীকে বল আমাদের ভয় দেখানো নিরর্থক। আমরা যা উচিত মনে করব, তা করবই। তাতে যদি হাইল্যাণ্ডে আগুন জ্বলে, তবে হাইল্যাণ্ডারদের রক্তেই সে আগুন নিভবে।"

ছয়

মুখে যতই আস্ফালন করুন, আর্জিলএর ডিউক এই পাহাড় অঞ্চল থেকে সরে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গলব্রেইথের উপর আদেশ দিলেন নিকটবর্তী এক পুরোনো ভাঙ্গা দুর্গে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করবার জন্যে। আর অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে তিনি নিজে চললেন ফোর্থ নদীর দিকে। ফোর্থ পেরুলে ওটা আর হাইল্যাণ্ড নয়। ওখানে গিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে ম্যাক্‌গ্রেগরের ফাঁসি দিতে পারবেন। সেটা এখানে দিলে সমারোহ হবে না, নিজের সৈন্যেরা ছাড়া এখানে তো অন্য দর্শক নেই! আর্জিল চান গোটা দেশের লোককে নিমন্ত্রণ করে এনে দেখানো যে রাজদ্রোহীকে দণ্ড দেবার ক্ষমতা রাজা জর্জএর সত্যিই আছে।

বৃহৎ সেনাদল চলেছে পাহাড় পেরিয়ে। ফ্রাঙ্ককে হেলেন ম্যাক্‌গ্রেগরের কাছে ফিরে যেতেই বলেছিলেন আর্জিল। কিন্তু তা সে যায়নি, বলেছে—"আপনি আমাকে সেখানে যেতে বলছেন কেন? আমি তো তাদের লোক নই, তাদের জাতির বা ধর্মেরও না। তারা হাইল্যাণ্ডার দস্যু, আমি ইংরেজ ভদ্রলোক। তারা ক্যাথলিক, আমি প্রোটেস্টাণ্ট। দৈবাৎ তাদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম বলেই তাদের আদেশে আপনার কাছে দৌত্য নিয়ে আসতে হয়েছে। এসে যখন পড়েছি, তখন আর ফিরে যাচ্ছি না। আমি আপনার সৈন্যদলের সঙ্গেই ফোর্থ পেরিয়ে যাব।"

আর্জিল এতে আপত্তি করেননি। ফ্রাঙ্কও চলেছে ঘোড়ার পিঠে। সে সৈনিক নয়, কাজেই সেনাদলের সঙ্গে চললেও, সৈনিকদের মত লাইন বেঁধে তাকে চলতে হচ্ছে না। ওদের গতির পথে বাধা সৃষ্টি না করে এদিকে ওদিকে জায়গা বদল করার স্বাধীনতা তার আছে।

এমনি ভাবে ঘোরাফেরা করতে করতে একবার সে যখন এসে দলের পাশে নতুন একটা স্থান গ্রহণ করেছে, তখন হঠাৎ দেখতে পেল ঠিক তার পাশেই সর্দার ম্যাক্‌গ্রেগর।

একটা তাগড়া ঘোড়ার পিঠে প্রকাণ্ড একটা পাহাড়িয়া সৈনিকের ঠিক পিছনে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সৈনিকের দেহের সঙ্গে ম্যাক্‌গ্রেগরের দেহ চামড়ার পেটি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। তা ছাড়া তার আগে পিছে অস্ত্রধারী পাহারা তো আছেই।

বিকাল বেলায় রোদ্দুর তখন লালচে হয়ে এসেছে, সেই লালচে রোদ্দুর এসে পড়েছে ম্যাক্‌গ্রেগরের লাল চুলের উপরে। এর আগে লোকটির খোলা মাথা ফ্রাঙ্ক কখনও দেখেনি। তাই আজ সে অবাক্ হল এই দেখে যে ওর চুলগুলো অস্বাভাবিক রকম লাল। এই লাল চুলের দরুনই তার ডাক নাম রব রয়। হাইল্যাণ্ডের ভাষায় রয় শব্দের অর্থ লাল। রব রয় অর্থাৎ লাল রবার্ট।

লাল চুলে লাল রোদ্দুর, রবের আশেপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই লাল রঙের খেলা চলছে। একটা রক্তের ঢেউ যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে দস্যুসর্দারকে। ফ্রাঙ্কের হঠাৎ মনে হল—একি ওর মৃত্যুরই পূর্বাভাস? বাস্তবিক এই শক্ত বাঁধন থেকে উদ্ধার পাওয়া এবার যেন ম্যাক্‌গ্রেগরের পক্ষে খুবই শক্ত মনে হচ্ছে।

ম্যাক্‌গ্রেগর ফ্রাঙ্ককে দেখেছেন বা চিনেছেন এমন কোন চিহ্নই প্রকাশ করল না। আর ফ্রাঙ্ক, বাইরের লোক হিসেবে তার তো অধিকারই নেই বন্দীর সঙ্গে কথা কইবার। সে শুধু নীরবে পাশে পাশে এগিয়ে চলল।

অতি মৃদু স্বরে ম্যাক্‌গ্রেগর কথা কইছেন আইভানের কানে কানে। ঐ দৈত্যের মত পালোয়ান পাহাড়িয়া সৈনিকটার নামই আইভান।

ম্যাক্‌গ্রেগর বলছেন —"আইভান! তোমার বাবা কখনও নিজের জাতের একটা মানুষকে এভাবে ফাঁসিকাঠে তুলে দেবার জন্যে বেঁধে নিয়ে যেতেন না।"

আইভান জবাব দিল না। কেবল একটা চাপা ঘড়ঘড় শব্দ যেন শোনা গেল তার গলার ভিতরে।

ম্যাক্‌গ্রেগর ডাইনে বাঁয়ে একবার তাকিয়ে নিলেন। না, কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে না, তাঁর চুপি চুপি কথা শুনতেও পায়নি কেউ। ফ্রাঙ্ক? তাকে যে তিনি দেখতে পেয়েছেন, এমন ভাবই প্রকাশ করলেন না। অর্থাৎ, ফ্রাঙ্কের দিক্ থেকে তাঁর কোনও বিপদ ঘটতে পারে না, এবিষয়ে তিনি ষোলআনা নিশ্চিন্ত।

আবার তিনি আইভানের কানে কানে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—"মনে করে দেখ আইভান, আমি তোমায় অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছি, গতরে খেটেছি তোমার জন্যে, তরোয়াল নিয়ে লড়াই পর্যন্ত করেছি তোমার বিপদের সময়। সেই আমি আজ দুঃসময়ে পড়েছি, তুমি কি আমায় ফাঁসি থেকে বাঁচাবার জন্যে কিছুই করবে না?"

এবারও আইভানের গলা দিয়ে একটা কাতর ঘড়ঘড়ির আওয়াজ বেরুল, মুখে কথা ফুটল না। এর একটু পরেই রাস্তাটা সরু হয়ে এল হঠাৎ, ফ্রাঙ্ক আর ম্যাক্‌গ্রেগরের পাশের জায়গাটা বজায় রাখতে পারল না, পিছনে হটে আসতে হল তাকে। তবু ম্যাক্‌গ্রেগরের উপর থেকে চোখ সে সরাল না। মাঝে মাঝে ম্যাক্‌গ্রেগরের মুখ সে আইভানের কানের কাছে দেখতে পাচ্ছে, আর অনুমান করছে যে বন্দীকে মুক্তি দেবার খুব অনিচ্ছা আইভানের নেই। তা না হলে তো এতক্ষণ সে চেঁচিয়ে উঠে সেনাপতির কাছে খবর পাঠাত যে দস্যু পালাবার ফিকিরে আছে।

ফোর্থ নদীটা বেরিয়েছে এক বড় হ্রদ থেকে। দু'ধারে উঁচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে তীব্র স্রোত। যেখানে জলের তলায় পাহাড় নেই, সেখানে নদী অতি গভীর; যেখানে পাহাড় আছে, সেখানে গভীরতা এক এক জায়গায় খুবই কম। এই জায়গাগুলিতেই কোথাও কোথাও নদী পারাপার করা চলে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে। যেখানে চোরা পাহাড়ের বুকে গর্ত আছে, সেখানে ঘোড়া সাঁতার

দেয়। যেখানে গর্ত নেই, সেখানে চলে যায় পায়ে হেঁটে। আগাগোড়া এপার থেকে ওপার সাঁতার দেওয়া কোন ঘোড়ারই কর্ম নয়।

এই রকম একটা পারাপারের ঘাটে এসে সৈন্যদল থামল। ঠিক ঘাটের উপরেই খাড়া পাহাড়, কাজেই একসঙ্গে বেশী লোক জলের ধারে পৌঁছাতে পারছে না। একজন জলে নামছে, তারপর একজন পাহাড় থেকে ঘাটে নামছে। তাতে দেরি ও হচ্ছে, বিশৃঙ্খলাও হচ্ছে।

ফ্রাঙ্ক এতক্ষণে ম্যাক্‌গ্রেগর-আইভানের অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছে। পাহাড়ের মাথায়, সৈন্যদের লাইনের থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে সে পারাপার দেখছে। নদীর বুকে অস্তসূর্য যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে, একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া থমথম করছে যেন আকাশ পাহাড় আর নদীর স্রোতে।

আইভানের ঘোড়া জলে নেমেছে। আগের পাহারাওয়ালার ঘোড়া সাঁতার শুরু করেছে, এখানে পায়ের নীচে সে পাথর পাচ্ছে না। পিছনের পাহারাওয়ালা সবে জলে নেমেছে, কয়েক গজ পিছিয়ে পড়েছে বন্দীর ঘোড়া থেকে।

হঠাৎ কী একটা কাণ্ড হয়ে গেল। একটা চিৎকার বার হল কয়েক হাজার সৈনিকের কণ্ঠ থেকে। আর্জিলএর ডিউক আগেভাগে নদী পেরিয়ে ওপার থেকে লক্ষ্য রাখছিলেন বন্দীর উপরে, তিনি চেঁচিয়ে অভিসম্পাত করে উঠলেন আইভানকে।

ঘোড়ার উপরে আইভান একা, ম্যাক্‌গ্রেগর সেখানে নেই!

ম্যাক্‌গ্রেগরের ফিসফিসানি তাহলে বৃথা যায়নি! ঘোড়া সাঁতার জলে পৌঁছুতেই সে চামড়ার পেটি খুলে দিয়েছে, যে পেটিটা দিয়ে ম্যাক্‌গ্রেগরের দেহ তার দেহের সঙ্গে এঁটে বাঁধা ছিল। চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে পড়েছে বন্দী, ডুবে গিয়েছে নদীর জলে।

অদৃশ্য! ডুবসাঁতার দিয়ে কোন্ দিকে যে চলেছেন, কে বলবে! তবে একসময়ে তাঁকে উঠতেই তো হবে, নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে। সেই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করে রয়েছে কয়েক হাজার সৈনিক। ওঁর

গতিপথের একটা হদিস পেলে ওরাও লাফিয়ে পড়তে পারে নদীর জলে।

আর্জিল হুংকারের পর হুংকার করে চলেছেন ওপার থেকে। দুই পার থেকেই সেনানায়কেরা উলটোপালটা হুকুম চালাচ্ছেন নিজের নিজের সৈনিককে লক্ষ্য করে। কেউ বলছেন—ভাটির দিকে যাও। কেউ বলছেন—উজিয়ে যাও। কেউ বলছেন—বন্দুকে গুলি ভরে ঠিক হয়ে থাক, কেউ আবার বলছেন—বল্লম উঁচিয়ে ধর।

অবশেষে অনেকটা ভাটিতে ম্যাক্‌গ্রেগরের মাথা জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি ছুটল হাজার খানেক, বল্লম ছুটল কম করেও দু'হাজার। কয়েক শো উৎসাহী সৈন্য একসঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার ফলে জড়াজড়ি বেধে গেল এর ঘোড়ার সঙ্গে ওর ঘোড়ার, এর তরোয়ালের সঙ্গে ওর বল্লমের।

ফ্র্যাঙ্কের সন্দেহ হল যে পলাতক বন্দীকে ধরবার আগ্রহ সত্যি সত্যি খুব কম সৈনিকেরই আছে। এরা অনেকেই হাইল্যাণ্ডার, নিজের জাতের ম্যাক্‌গ্রেগরকে ফাঁসিতে লটকানোর কল্পনা ওদের কারোই নেই। বরং সে কল্পনা যাদের আছে, তাদের বাধা দেওয়াই এখন ওদের একমাত্র কাজ।

ইতিমধ্যে আইভানকে ধরে নিয়ে ওপারে হাজির করে দিয়েছে অন্য সৈন্যেরা। একটা বিশ্রী অভিশাপ করে আর্জিল তাকে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে আঘাত করলেন, তারপর তিনি কী একটা হুকুম করতেই সৈন্যেরা তাকে টেনে নিয়ে গেল। হয়ত তার বিচার হবে সামরিক আদালতে, হয়ত সে পালাবে, কিংবা হয়ত গুলি করে তাকে মেরে ফেলা হবে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে। কিন্তু মেরে ফেললে ব্যাপার সেখানেই মিটবে না, ম্যাক্‌গ্রেগরের প্রতিহিংসা ফিরবে আর্জিলের পিছনে পিছনে। বড়লোক মাত্রই শিকারে যায়। বনে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজাও একসময়ে আততায়ীর বর্শায় প্রাণ দিয়েছেন, আর্জিল তো তুচ্ছ! আর্জিল জানেন

ম্যাক্‌গ্রেগর যখন মুক্ত হয়েছেন, তখন আইভানকে বধ করলে তিনি পার পাবেন না।

ফ্র্যাঙ্ক ভাবতে লাগল, তার এখন কী করা উচিত? কাল সন্ধ্যা থেকে যাকিছু সে করেছে, নিজের ইচ্ছেয় তার একটাও করেনি। থর্নটন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন পাহাড়ের রাজ্যে, তারপর হেলেন ম্যাক্‌গ্রেগর তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে আর্জিলের কাছে, তারপর আর্জিলের সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রাণের দায়েই ফোর্থের তীর পর্যন্ত আসতে হয়েছে, কারণ না এলে আবার হাইল্যাণ্ডার দস্যুদের কবলেই পড়তে হয়।

হ্যাঁ, এযাবৎ তার স্বাধীন ইচ্ছা খাটাবার কোন সুযোগ হয়নি, কিন্তু এবার তো আর তা বলা যায় না! ম্যাক্‌গ্রেগরের এলাকা থেকে এ জায়গা বহুদূরে, এখানে হেলেনের চরেরা তার নাগাল পাবে না নিশ্চয়ই! ওদিকে আর্জিলের সৈন্যরাও নিজের ধান্দায় পাগল হয়ে আছে, সে অলক্ষ্যে সরে পড়লে কেউ তার অনুপস্থিতির কথা টেরই পাবে না।

আর্জিলের পিছনে পিছনে ফোর্থের ওপারে গিয়ে তার লাভও তো নেই! তার কাজ হল চোরাই হুণ্ডিগুলোর খবর পাওয়া! সে খবর দিতে পারেন একমাত্র ম্যাক্‌গ্রেগর, অন্তত পারবেন বলে ম্যাক্‌গ্রেগর ভরসা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো এখন ফোর্থের জলে। অচিরেই তিনি কূলে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং উঠে আর যেদিকেই যান, ফোর্থের ওপারে কখনই যাবেন না, আর্জিলের হাতে আবার ধরা পড়বার জন্যে। তাঁকে যদি পেতে হয়, ফোর্থের এই দিক্‌কার তীরে তীরে এগিয়ে যেতে হবে ভাটির দিকে।

সুতরাং ফ্র্যাঙ্ক লুকিয়ে পড়ল একটা টিলার আড়ালে। এবং যা সে ভেবেছিল, ঘটলও তাই। সে যে নেই, তা সৈন্যরা কেউ লক্ষ্যই করল না। তারা আরও খানিকক্ষণ ম্যাক্‌গ্রেগরকেই এলোপাতাড়ি খোঁজা-খুঁজি করে একে একে নদী পেরিয়ে আর্জিলের শিবিরে গিয়ে হাজির হল।

এদিকের কূল যখন জনশূন্য হল, তখন আকাশে আর সূর্যের শেষ রশ্মিটিও নেই। গোধূলির মলিন আলোও ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। তারই মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালিয়ে দিল ভাটির দিকে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালানো অত সোজা নয় এ জায়গায়। সমুখে কোথাও একটা পাহাড়ের টুকরো দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও নদীর ধার জুড়ে আছে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। কখনও ঘোড়া ধীরে ধীরে চালাতে হয়, কখনও নেমে পড়তে হয় একেবারে। নেমে লাগাম ধরে, পথ পরিষ্কার করে হাঁটতে হয় অতি সাবধানে। গতি ক্রমে মন্থর হয়ে এল। আকাশে কোথায় একফালি চাঁদ উঠেছে, তাকে চোখে দেখা যায় না, তবে একটা মরা জোছনা এক এক জায়গায় এসে পড়েছে —বন যেখানে একটু পাতলা, সেখানেই তা ঠাহর করা যায়।

নদী কোন্‌দিকে কোথায় ঘুরে গিয়েছে, ফ্র্যাঙ্ক আর আন্দাজ করতে পারে না। তখন সে নিজে পথ খুঁজবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার উপরেই সে কাজের ভার ছেড়ে দিল। এই সব পশুর কী রকম একটা শক্তি আছে, কিছু চোখে না দেখেও অনুমানের উপর নির্ভর করে ঠিক পথে চলতে পারে।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলছে ফ্র্যাঙ্কের ঘোড়া। নিজের বুদ্ধিতে এই জন্তুটা নিবিড় বন থেকে বেরুতে পেরেছে, একটা শেয়াল-চলা সরু পথ ধরে ক্রমে এসে পড়েছে এমন একটা রাস্তায়—যেটা উঁচু নীচু হলেও চলাচলের যোগ্য। লোকজন যে তাতে চলে ফেরে—তার প্রমাণও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

এবারে ফ্র্যাঙ্ক কতকটা নিশ্চিন্ত হল। এ রাস্তা নিশ্চয় কোথাও না কোথাও লোকালয়ে গিয়ে মিশেছেই। হয়ত এবারফয়েলেই গিয়েছে। তা যদি হয়, রাতটা সেখানে বিশ্রাম করে পরদিন সকাল থেকে আবার ম্যাকগ্রেগরের খোঁজ শুরু করা যাবে।

তরুণ বয়সের সুবিধাই এই যে কোন উদ্বেগের বোঝাই মনকে বেশীক্ষণ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ফ্রাঙ্কও সব অনিশ্চয়তা, সব

দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চাঁদের আলোয় ধোয়া নৈশ বনপথের শোভা নিরীক্ষণ করতে লাগল। নিজের অজান্তে একটা গানের কলিও বুঝি ভাঁজতে লাগল গুনগুন করে।

এত অন্যমনস্কই সে হয়েছিল যে পিছন থেকে দুই দুইজন অশ্বারোহী যখন তার একেবারে কাছে এসে পড়েছে, তখনও সে টের পায়নি তাদের উপস্থিতি।

টের পেল, যখন তাদের মধ্যে একজন গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল—"কোথায় চলেছ বন্ধু? এত রাত্রে?"

কথা শুনেই ফ্রাঙ্ক বুঝল লোকটি হাইল্যাণ্ডার তো নয়ই, স্কচও নয়, খাঁটী ইংরেজ।

"আমি যাচ্ছি এবারফয়েল।"

"এবারফয়েল থেকে হাইল্যাণ্ডে ঢুকবার পাহাড়িয়া রাস্তাটা খোলা আছে তো? যাওয়া যাবে সেপথে? মানে, লড়াইটড়াই হচ্ছে না তো সেদিকে?"

"আজ পথ খোলা আছে কিনা জানিনে, তবে লড়াইটড়াই ওখানে হচ্ছে মাঝে মাঝে। কালই হয়েছে। রাজসৈন্যের একটা দল হেরে গিয়েছে সে লড়াইয়ে, কেউ মরেছে, কেউ মরার মত হয়ে বন্দী হয়েছে।"

"তুমি জানলে কী করে?"

"বাঃ, আমাকে যে বাধ্য হয়ে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল সেখানে। রাজসৈন্যের কাপ্তেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে!"

"ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কেন? কী অপরাধে?"

এতক্ষণে ফ্রাঙ্কের খেয়াল হল যে লোকটি অনধিকার চর্চা করছে। সে বিরক্তভাবে বলল—"আপনি কেন অত প্রশ্ন করছেন আমাকে? আমি কি প্রশ্ন করতে গিয়েছি আপনাকে? আপনি ইংরেজ, আমিও ইংরেজ। একটা পরামর্শ দিলাম ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয় আপনাদের পক্ষে। তবু যদি যেতে চান, যান। আমার সম্বন্ধে অত খোঁজ নেবার কী দরকার?"

দ্বিতীয় অশ্বারোহী কথা কইল একবার। যে স্বরে কথা কইল, তা শুনে ফ্রাঙ্ক চমকে উঠল, শিউরে উঠল, মুগ্ধ হয়ে গেল। সে স্বর ডায়না ভারননএর।

"মিস্টার ফ্রানসিস, তোমার গান শুনেই তোমার পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি। সেইজন্যেই উনি অত খোঁজ নিচ্ছেন তোমার সম্বন্ধে।"

"কিন্তু তুমি এখানে? এ সময়ে? এ কী আশ্চর্য মিস ভারনন?" এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না ফ্রাঙ্ক।

"রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে ডায়না, তোমার ভাইয়ের জিনিসগুলো দিয়ে দাও। দিয়ে চল, আমরা নিজের পথে এগিয়ে পড়ি।"

ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারল না, তার কী জিনিস ডায়না তাকে দেবে। বুঝবার দিকে তার মনও ছিল না সেই মুহূর্তে। সে তখন আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিল—ডায়নার এই নিশীথ রাতের সহচরটি কে! প্রথমে ভেবেছিল, এ র‍্যাশলি। কিন্তু র‍্যাশলির কণ্ঠস্বর তো সে চেনে! তা ছাড়া ঘোড়ার উপরে বসে থাকলেও বোঝা যাচ্ছে, এ লোকটি র‍্যাশলির চাইতেও বেশ খানিকটা লম্বা। তবে কি র‍্যাশলির ভাইয়েরা কেউ? না না, তাদেরও স্বর ফ্রাঙ্কের খুব চেনা। তা ছাড়া, তাদের কারও কথাবার্তা এত মার্জিত নয়। তারা দুটো কথা কইতে গেলেই তার ভিতর থেকে একটা অসভ্য শব্দ বেরিয়ে পড়ে।

এ তবে কে? কিন্তু এ সমস্যার মীমাংসা হল না ডায়না তার ঘোড়া ফ্রাঙ্কের পাশে এনে, কী একটা পুলিন্দা তার হাতে দিল। আর অবাক্ কাণ্ড! সেই মুহূর্তে ফ্রাঙ্ক অনুভব করল, এক ফোঁটা জল ডায়নার চোখ থেকে ঝরে পড়ল তার গালের উপর।

ডায়না কাঁদছে! কাঁদতে কাঁদতেই ফিসফিস করে বলল—"ফ্রাঙ্ক! বিদায়! চিরবিদায়!"

তারপরই ডায়না আর তার সঙ্গী ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল? ওরা কি এবারফয়েলের দিকে গেল? না, পাহাড়ের দিকে? ওদের পিছনে ঘোড়া ছোটানো অভদ্রতা হবে। কিন্তু,

কিন্তু—ডায়নাকে কি আর সে দেখতে পাবে না? সে বলে গেল, "চিরবিদায়!" এর মানে কী? ওর সঙ্গী ও কে? এত রাত্রে ডায়না যার সঙ্গে একাকিনী বনে জঙ্গলে ঘুরতে দ্বিধা করছে না, সে তো নিশ্চয়ই তার অতি নিকট আত্মীয়! র‍্যাশলিরা কেউ যখন নয়, এ তবে কে?

ডায়না একটা পুলিন্দা তার হাতে দিয়ে গেল. এটাই বা কী? অন্ধকারে দেখবারও উপায় নেই।

নানারকম চিন্তা করতে করতে ওদের গমনপথের দিকেই সে আবার ঘোড়া চালাচ্ছে, এমন সময় কে একজন পাশ থেকেই বলে উঠল—"রাতটা বড্ড ঠাণ্ডা, কী বলেন মিস্টার ফ্রানসিস?"

"মিস্টার ম্যাক্‌গ্রেগর? মিস্টার ক্যাম্পবেল?" আনন্দে অধীর হয়ে ফ্রাঙ্ক ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, বলল—"আপনি নিরাপদে নদী থেকে উঠে এসেছেন—এতে আমি কত যে খুশী—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে! কিন্তু আপনি আপনার হুণ্ডিগুলো পেয়েছেন তো? আমি এবারফয়েলে কেন যেতে পারিনি, তা তো জানেন! কিন্তু হুণ্ডি ফেরত দেবার জন্যে মিস ভারনন যে চিঠি আমাকে লিখেছিলেন, তা তো আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম! তিনি কি এখনও দেননি ফেরত?"

হুণ্ডি! এতক্ষণে ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারে পুলিন্দার ভিতরে হুণ্ডিগুলিই আছে। কিন্তু কে সেই অজ্ঞাত পুরুষ, যিনি ডায়নার হাত দিয়েই তাকে তার ঈপ্সিত বস্তু ফেরত দিয়ে গেলেন?

সাত

এবারফয়েলে আর যাওয়া হল না। জার্ভিকে নিয়ে আসবার জন্যে ম্যাক্‌গ্রেগরের সাথে সাথে তার বাড়িতেই আবার যেতে হল ফ্রাঙ্কের। এখানকার কাজ তার ফুরিয়েছে, এবারে ফিরতে হবে গ্লাসগোতে, সেখানে আওয়েনের হাত দিয়ে হুণ্ডিগুলি ভাঙানো, পাওনাদার কোম্পানিগুলির যার যা পাওনা, সব মিটিয়ে দেওয়া—অনেক কাজই করবার আছে। কী ভাবে যে ম্যাক্‌গ্রেগরের কাছে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে, তা ভেবেই পায় না ফ্রাঙ্ক।

ম্যাক্‌গ্রেগর কিন্তু বললেন—"আপনার যা কিছু কৃতজ্ঞতা, তা ডায়নার প্রাপ্য। আমিও কিছু দাবি করতে পারি না, কর্তাও কিছু দাবি করতে পারেন না।"

"কর্তাটি কে ?" অবাক্ হয়ে জানতে চায় ফ্রাঙ্ক।

"তাঁকে তো দেখেছেন ডায়নার সঙ্গে।" উত্তর দেন সর্দার।

"তা তো দেখেছি, কিন্তু কে তিনি ? কর্তা মানে কী ? কিসের কর্তা ?"

এসব প্রশ্নের আর জবাব পাওয়া যায় না রব রয়ের মুখ থেকে।

এদিকে যতই তারা হাইল্যাণ্ডের বুকের ভিতর এগিয়ে যায়, ততই ম্যাক্‌গ্রেগরের মুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়ে ঝড়ো হাওয়ায় দাবানলের মত। নিশীথ রাতে পাহাড়ে পাহাড়ে জমায়েত হয় পাহাড়িয়া স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও বালক। আনন্দের সে কী তাণ্ডব! নাচ, গান, ব্যাগপাইপের বাজনা, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে পাহাড়গুলো গমগম করতে লাগল সারা রাত।

হেলেন, হ্যামিশ আর রবার্টের চোখে জল, মুখে হাসি। যমের

মুখ থেকে ফিরে এসেছে তাদের সবচেয়ে আপনজন, এখন তারা যমকেও লড়াই দিতে ভয় পায় না।

সর্দার কিন্তু মরিসের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করলেন না। জার্ভিকে বললেন—"আমি না থাকাতেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটল।"

থর্নটনকে আর তাঁর সৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি দিলেন সর্দার, আর জার্ভিকে পরিশোধ করে দিলেন তার হাজার পাউণ্ডের দেনা। তারপর জার্ভি আর ফ্রাঙ্ককে খাইয়ে দাইয়ে বিছানা পেতে দিলেন, রাত্রিটা বিশ্রাম করবার জন্যে।

ফ্রাঙ্ক জানতেও পারল না যে সেই একই বাড়িতে অন্য একটি ঘরে রাত কাটাচ্ছে ডায়না আর তার সঙ্গী। জানলে সে শান্তি পেত, না অশান্তি ভোগ করত—বলা কঠিন।

ভোরবেলা হ্রদে একখানা নৌকা দেখা গেল। ডুগাল সেই নৌকায় করে জার্ভিকে আর সভৃত্য ফ্রাঙ্ককে পৌঁছে দেবে হ্রদের শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে এবারফয়েল বেশী দূরে নয়। ঘোড়াগুলো নিয়ে সর্দারের অন্য একজন লোক আগে রওনা হল।

যতক্ষণ নৌকা দৃষ্টির বাইরে চলে না গেল, ম্যাক্‌গ্রেগর দাঁড়িয়ে থাকলেন পাহাড়ের মাথায়, ফ্রাঙ্কের উপর তাঁর যেন একটা অহেতুক মায়া পড়ে গিয়েছে।

গ্লাসগোতে পৌঁছেই ফ্রাঙ্ক আশ্চর্য হয়ে দেখল—তার বাবা বসে আছেন আওয়েনের ঘরে। র‍্যাশলির বেইমানির খবর কোনরকমে পেয়েই তিনি হল্যাণ্ড থেকে চলে এসেছেন। হুণ্ডিগুলি ফেরত পেয়ে তো তিনি খুশী হলেনই, তার চাইতে বেশী খুশী হলেন ফ্রাঙ্কের সাহস আর কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে। তাঁর সুনাম রক্ষার জন্যে সেই পুত্রই জীবনপণ করে পরিশ্রম করেছে, ঝাঁপ দিয়েছে ভয়ংকর সব বিপদের মুখে—যে পুত্রকে অকর্মণ্য বলে তিনি বনবাস দিয়েছিলেন। অনুতাপে তাঁর ক্রোধ আর অসন্তোষ গলে জল হয়ে গেল।

দেনা শোধ করে ফেলতে মিস্টার অসওয়ালডিস্টোনের বেশী সময় লাগল না। জার্ভিকে এবার তিনি ঠিকমত চিনেছেন। নিজের

বিপুল ব্যাবসার একমাত্র প্রতিনিধি পদে তাঁকেই তিনি নিয়োগ করলেন। বিশ্বাসঘাতক ম্যাক্‌ভাইটির সঙ্গে সকল সম্পর্কই ছেদন করলেন একেবারে।

কাজ সব শেষ হতে না হতেই দারুণ দুঃসংবাদ এল আবার। তাঁর ব্যক্তিগত কিছু নয়, সারা দেশের উপর নেমে এল বিপ্লবের দুর্দিন। স্কটল্যাণ্ডের লর্ড মার নির্বাসিত রাজা জেমস্‌কে স্কটল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করে দিয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। অসওয়ালডিস্টোন ফ্রাঙ্ক আর আওয়েনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন লণ্ডনে।

লোকে বলে লর্ড মার নির্দিষ্ট তারিখের আগেই অভিযান শুরু করেছিলেন। রাজা জেমসের নিজস্ব প্রতিনিধি লর্ড বোশাম্প সংকেত পাঠাবার আগেই। তার ফলে জেমসের দলভুক্ত লোকদের দারুণ অসুবিধায় পড়তে হল। সবাই তখনও প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি। আধা-প্রস্তুত অবস্থায় যারা লড়াইয়ে যোগ দিতে এল, তারা পরাজিত হল। অনেকে আবার এ অবস্থায় পিছিয়েই পড়ল একেবারে। বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার কল্পনা ত্যাগ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল বাড়িতে।

যারা কিছুতেই পেছপা হল না, ক্যাথলিক ধর্মের টান যাদের রাজা জেমসের পতাকার নীচে সত্যি সত্যি এনে জমায়েত করল, তাদের মধ্যে একজন হলেন সার হিলডিব্রাণ্ড অসওয়ালডিস্টোন। তাঁর পাঁচ পুত্র নিয়ে তিনি বিদ্রোহিদলে যোগ দিলেন। পাঁচ পুত্র নিয়ে বলবার কারণ, র‍্যাশলি তখন পর্যন্তও নিরুদ্দেশ। সেই হল তাঁর কাল। একে একে তাঁর পাঁচটি পুত্রই মারা গেল। সবাই যে যুদ্ধেই মারা গেল, তা নয়। একজন গেল নিজেরই দলের এক ক্ষুদে অফিসারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। আর একজন গেল অতিরিক্ত মদ খেয়ে খেয়ে পিলে ফেটে। আরও একজন সাধারণ কী একটা রোগে। যুদ্ধে মারা গিয়েছিল মাত্র দুইজন।

যুদ্ধে বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয় হল। সার হিলডিব্রাণ্ড নিজে বন্দী হয়ে রইলেন লণ্ডনের নিউগেট জেলে। সেইখানে একদিন তাঁর দাদা এলেন তাঁকে দেখতে। দুই ভাইয়ে পঞ্চাশ বছর পরে এই সাক্ষাৎ।

হিলডিব্রাণ্ড তখন একটা দরকারী কথা জানালেন তাঁর দাদাকে। যুদ্ধে যোগ দেবার আগে তিনি উইল করেছিলেন। উইল আছে জাস্টিস ইঙ্গলউডের কাছে। সে উইলের মর্ম হল এইরকম—

হিলডিব্রাণ্ডের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা পরপর অধিকারী হবে তাঁর সম্পত্তি ও উপাধির। অর্থাৎ প্রথমটি মরলে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টি মরলে তৃতীয়টি—এইভাবে। কিন্তু সবচেয়ে ছোট র‍্যাশলি কোনদিনই অধিকারী হবে না এসবের। কারণ তাঁর দাদার হুণ্ডিচুরির সংবাদ পেয়ে তার উপরে হিলডিব্রাণ্ড অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি ব্যবস্থা করেছেন—এমন যদি কখনও হয় যে র‍্যাশলি ছাড়া আর কোন ছেলে হিলডিব্রাণ্ডের জীবিত নেই, তাহলে তখন র‍্যাশলিকে টপকে সম্পত্তি এবং উপাধির অধিকারী হবে হিলডিব্রাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রাঙ্ক অসওয়ালডিস্টোন।

ফ্রাঙ্কের বাবা এতে আপত্তি করবার কোন কারণ দেখতে পেলেন না, কারণ সম্পত্তিটা ন্যায়তঃ তাঁর নিজেরই ছিল। তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেই তাঁর পিতা ওটা হিলডিব্রাণ্ডকে দিয়ে যান। আজ যদি ভগবানের ইচ্ছায় হিলডিব্রাণ্ডের সুমতি হয়ে থাকে, ন্যায্য অধিকারীর হাতেই সম্পত্তিটা আবার ফিরে আসুক না কেন! বিশেষত র‍্যাশলি লোক অতি দুশ্চরিত্র, তার হাতে পড়লে অসওয়ালডিস্টোনদের উপাধিটাই কলঙ্কিত হবে।

এর অল্পদিন পরেই প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদের বেছে নিয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া শুরু হয়ে গেল। সার হিলডিব্রাণ্ডও পড়ে গেলেন এই দলে। তাঁর দাদা যথেষ্ট চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না তাঁকে।

ইতিমধ্যে র‍্যাশলির নাম আবার শোনা যেতে লাগল। যুদ্ধে

পরাজয়ের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পেরে র‍্যাশলি আগে থাকতেই বিদ্রোহিদল ত্যাগ করে রাজভক্তের দলে ভিড়ে পড়েছিল। তার ব্যক্তিগত ক্রোধও ছিল লর্ড বোশাম্পের উপরে। ফ্রাঙ্কের হুণ্ডিগুলি ফেরত দেওয়ার জন্যে ডায়না যখন ম্যাক্‌গ্রেগরের মারফত বোশাম্পকে অনুরোধ করে চিঠি লেখে, তখন বোশাম্প জোর করেই র‍্যাশলির হাত থেকে ওগুলি কেড়ে নেন। বোশাম্প বিদ্রোহিদলের সর্বময় নেতা। র‍্যাশলি সামান্য একজন উপনেতা ছাড়া কিছু নয়, এইজন্যে সে বোশাম্পের আদেশ অমান্য করতে পারেনি। কিন্তু লক্ষ পাউণ্ড হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তার মন তখনই ভেঙে গিয়েছিল। সিংহাসনে ক্যাথলিক জেমস্‌কে বসাবার সব আগ্রহ একেবারেই উবে গিয়েছিল স্বার্থহানির দরুন। এখন সে রাজপক্ষের গুপ্তচর, এবং তার বাবা উইল করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে যদিও বঞ্চিত করে গিয়েছেন, তবু সরকার পক্ষের সাহায্যে সে উইল নাকচ করে দিয়ে অসওয়ালডিস্টোন জমিদারি আর প্রাসাদ নিজে দখল করবার বিধিমতে চেষ্টা সে করছে।

এই সব বিবেচনা করে ফ্রাঙ্কের বাবা স্থির করলেন—আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নেই, ফ্রাঙ্ক এখুনি গিয়ে সম্পত্তি অধিকার করে বসুক। যে দখলকার, আইনের ঝগড়ায় সে নানাদিক দিয়েই সুবিধা পেয়ে থাকে।

পিতার আদেশে ফ্রাঙ্ক চলে গেল অসওয়ালডিস্টোন হলের উদ্দেশে। গিয়েই দেখা করল ইঙ্গলউডের সঙ্গে। সার হিলডিব্রাণ্ড যে তাঁর কাছেই নিজের উইল গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন—তা সে জানে।

ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আছে সেই এণ্ড্রু। সে এখন পাকাপাকি ভাবেই চাকরি করছে ফ্রাঙ্কের কাছে। অসওয়ালডিস্টোন হল ফ্রাঙ্কের অধিকারে আসছে শুনে সেখানকার সর্দারভৃত্য হওয়ার উচ্চাশাও সে মনে মনে পোষণ করছে বইকি!

ইঙ্গলউড আদর করেই গ্রহণ করলেন ফ্রাঙ্ককে। উইল তাকে দেখালেন ও দিয়ে দিলেন, কিন্তু একথাও জানালেন যে জমিদারি বা

প্রাসাদ দখল করা খুব সহজ হবে না তার পক্ষে। কারণ র‍্যাশলি ইতিমধ্যেই 'সার র‍্যাশলি' বলে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করেছে এবং ঘন ঘন যাতায়াত করছে এখানে। তার সহায় আছে তালুকদার স্ট্যাণ্ডিস, এদিককার নতুন জাস্টিস। ইঙ্গলউড নিজে প্রোটেস্টাণ্ট হলেও ক্যাথলিকদের নির্যাতনে তাঁর উৎসাহ নেই—এই অপরাধে এ অঞ্চলটার শান্তিরক্ষার ভার তাঁর হাত থেকে তুলে নিয়েছেন সরকার। এবং স্ট্যাণ্ডিসকেই দিয়েছেন সে ভার। স্ট্যাণ্ডিস ক্যাথলিক-নির্যাতনে খুব উৎসাহী, ডায়না ভারনন এবং তার পিতা সার ফ্রেডারিককে গ্রেফতার করবার জন্যে গোটা অঞ্চলটাই সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। র‍্যাশলি তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে ওই দুই পলাতককে সে নিশ্চয়ই ধরিয়ে দিতে পারবে। কাজেই স্ট্যাণ্ডিসের কাছে তার এখন খুব খাতির।

সেই পুরানো কেরানী জবসন এখন স্ট্যাণ্ডিসের অধীনেই কাজ করে, এবং ডায়নাকে ধরবার জন্যে সেও হন্যে হয়ে ঘুরছে। সেবারে ফ্রাঙ্ককে ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সে ডায়নার উপর রেগে তো ছিলই, এখন আবার নতুন প্রলোভন এসেছে তার সমুখে—ডায়নাকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার থেকে পুরস্কারও সে প্রচুর পাবে।

ইঙ্গলউডের কাছে কথাপ্রসঙ্গে এটাও ফ্রাঙ্ক জানতে পারল যে পাদরি ভগান নামে যিনি মাঝে মাঝে অসওয়াল্ডিস্টোনে এসে আতিথ্যগ্রহণ করতেন, তিনিই ছদ্মবেশী সার ফ্রেডারিক ভারনন ওরফে আর্ল বোশাম্প, ডায়নার বাবা।

এতক্ষণে ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারল, ডায়নার সঙ্গে রাত্রে সে দুই দুইবার কাকে দেখেছে—একবার প্রাসাদের বাতায়নে, আর একবার এবারফয়েলের বনপথে। এটাও সে বুঝতে পারল যে ম্যাক্‌গ্রেগরের মত দুরন্ত দস্যুর সঙ্গে পরিচয় বা তার উপরে হুকুম চালাবার অধিকার ডায়নার কোথা থেকে এসেছিল। বোশাম্পের কন্যা তো সমস্ত ক্যাথলিকের শ্রদ্ধার পাত্রী হবেই!

সেই অধিকার ডায়নার ছিল বলেই, তার মুখ চেয়ে ম্যাক্‌গ্রেগর

বার বার সাহায্য করেছেন ফ্রাঙ্ককে। ইঙ্গলউডের আদালতে তাকে বাঁচিয়েছেন, র‍্যাশলির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছেন, পরিশেষে হুণ্ডি ফেরত দেবার জন্যে দূরবর্তী বোশাম্পের কাছে ডায়নার অনুরোধ পৌঁছে দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল ফ্রাঙ্কের।

অসওয়ালডিস্টোন হলে যখন ফ্রাঙ্ক এসে পৌঁছোলো এগুরুকে নিয়ে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, তবু একটাও আলো জ্বলেনি, দরজা জানালা সব শক্ত করে ভেতর থেকে বন্ধ। একটা ভুতুড়ে বাড়ি যেন। হিলডিব্রাণ্ডের দৈত্যের মত ছয় ছয়টা ছেলের প্রেতাত্মা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বাড়ির আশেপাশে ভিতরে বাইরে। খুব সাহসী পুরুষ না হলে ফ্রাঙ্ক এ বাড়িতে রাত্রিবাস করবার কল্পনাই করতে পারত না।

অনেক ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কির পর অ্যাণ্টনি সিড্‌ল একটা ছোট্ট দরজা খুলে বাইরে এল। সিড্‌ল ছিল সার হিলডিব্রাণ্ডের সর্দারভৃত্য। বড় বিশ্বাস করতেন একে তিনি। যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে প্রাসাদটা দেখাশোনা করবার ভার তার উপরেই দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ও একা এ বাড়িতে বাস করছে। র‍্যাশলিকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি এযাবৎ। কারণ সে শুনেছে যে সার হিলডিব্রাণ্ডের উইল অনুসারে র‍্যাশলি সম্পত্তি পাবে না। পাবে ফ্রাঙ্ক অসওয়ালডিস্টোন।

সেই ফ্রাঙ্ককে সশরীরে হাজির হতে দেখেও কিন্তু বুড়ো সিড্‌ল যেন খুব খুশী হতে পারছে না। যেন সে না এলেই ভাল হত, যেন সে বাড়িতে না ঢুকে অন্য কোথাও গিয়ে রাত্রিবাস করলে ভাল হয়— এইরকমই ভাব যেন সিড্‌লের।

ফ্রাঙ্ক মনে করল—মামলা মকদ্দমা হয়ে তার দাবিটা আদালতে পাকা বলে স্বীকৃত হওয়ার আগে বোধহয় সে ফ্রাঙ্ককে দখল দিতে চায় না।

কিন্তু দখল না দিয়ে সে পারবে কেন? ফ্রাঙ্ক ঢুকে পড়ল তার

পাশ কাটিয়ে। ভিতরে সব অপরিষ্কার, কোন ঘরে ঝাঁটপাট পড়ে না, নেই আলো, নেই আগুন।

ফ্রাঙ্ক সোজা লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে হাজির হল। ডায়নার সঙ্গে সে এই ঘরেই বসত আগেকার দিনে। পুরানো স্মৃতির খাতিরে এই ঘরটাই সে নিজের বাসের জন্যে বেছে নিল। আর অবাক্ হয়ে দেখল, অন্য ঘরে আগুন না থাকলেও এঘরে আছে, আর ঘরখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও রয়েছে। এঘরে যে কেউ না কেউ বাস করেই, এতে ফ্রাঙ্কের সন্দেহ রইল না। হয়ত সিড্‌ল নিজেই বাস করে—এইরকম মনে হওয়ায় ফ্রাঙ্ক আর তা নিয়ে প্রশ্ন বাড়াল না। আগুনটা উসকে দিয়ে সিড্‌লকে বলল এইখানে তার জন্যে একটা বিছানা এনে দিতে। আর এগুরুকে বলল—গ্রাম থেকে তার চেনা-জানা জন দুই জোয়ান লোককে রাত্রে এনে এ বাড়িতে রাখতে। র‍্যাশলি যদি ফ্রাঙ্কের এ বাড়িতে অবস্থানের কথা জানতে পারে, হঠাৎ এসে ডাকাতের মত চড়াও হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এখন যেন তেন প্রকারেন ফ্রাঙ্ককে পথ থেকে সরাতে পারলে, তাতে সে কোনমতেই ইতস্তত করবে না।

সিড্‌ল আর এগুরু দুজনেই বেরিয়ে যেতে আগুনের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ফ্রাঙ্ক। আগের দিনে ডায়নার সঙ্গে কত কী গল্প করেছে এই ঘরে বসে। ফ্রাঙ্ক ভাবতে লাগল সেই সব কথা। হঠাৎ তার মনে হল, ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে কে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

চমকে ফিরে ফ্রাঙ্ক দেখল—ডায়না দাঁড়িয়ে আছে। একা ডায়না নয়, সঙ্গে তার সেই দীর্ঘকায় পুরুষটি। যাঁকে সে দেখেছিল সেদিন রাত্রেএবার ফয়েলের দিকে ডায়নার সাথে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায়।

উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে ফ্রাঙ্ক বলল—"সার ফ্রেডারিক, সেদিন আপনাকে ধন্যবাদ দেবার সময় পাইনি। সেদিনকার মহৎ উপকারের জন্যে আপনাকে আজ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

ডায়না বিষণ্ণ সুরে বলল—"সে সব কথা থাক ফ্রাঙ্ক। আমি আর

বাবা সারা দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। হেন বন্দর নেই, যেখানে যাইনি জাহাজ ধরে ফরাসী দেশে পালাবার জন্যে। রাজার সৈন্য এভাবে আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরছে যে সমুদ্রের তীর থেকে বার বার আমাদের উলটো পথে ফিরে আসতে হয়েছে। অবশেষে এসে এই পরিত্যক্ত বাড়িতে গোপনে লুকিয়ে আছি। সিড্‌ল আমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছে, তাই ভালবাসে খানিকটা ; সেইজন্যেই সে আশ্রয় দিয়েছে আমাদের। আজ তুমি এসেছ, তুমি আমাদের তাড়িয়ে দেবে না তো? আমরা রাজদ্রোহী, তুমি রাজার পক্ষের লোক—"

ফ্রাঙ্কের বুকটা যেন ফেটে যেতে চায়। সে তাড়িয়ে দেবে ডায়নাকে? যে ডায়নার জন্যে সে হাসতে হাসতে নিজের জীবনটা বিসর্জন দিতে পারে?

সে চেষ্টা করেও কথা কইতে পারছে না, এমন সময় সার ফ্রেডারিক বললেন—"আমরা বেশীদিন তোমার অসুবিধা ঘটাব না দুই একদিনের মধ্যেই ম্যাক্‌গ্রেগর এসে পড়বে, তখন জাহাজে না হোক, নৌকো করেও কোন এক জনহীন উপকূল থেকে আমরা ফ্রান্সের দিকে চলে যাব।"

"এমন চেষ্টা করবেন না!" এতক্ষণে কথা বললে ফ্রাঙ্ক— "যতদিন জাহাজের ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এইখানেই থাকুন আমি থাকতে আপনাদের কোন বিপদ হবে না এ বাড়িতে।"

হঠাৎ দরজায় করাঘাত শোনা গেল—এগুরু চেঁচিয়ে বলল— —"হুজুর! দুটো লোক এনেছি।"

লোকটা কি সার ফ্রেডারিকের কথা শুনল নাকি? লাফিয়ে উঠে ফ্রাঙ্ক দরজার কাছে চলে গেল, আর দরজা সামান্য মাত্র ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে বলল—"ওদের নিয়ে নীচের কোন ঘরে শুয়ে থাকো গিয়ে যদি রাত্রে কোন কারণে ওদের সাহায্যের দরকার হয়, তখন ডাকব।"

এগুরু নীচে নেমে গিয়ে বন্ধুদের কাছে বলল—"আমার মনিব কি
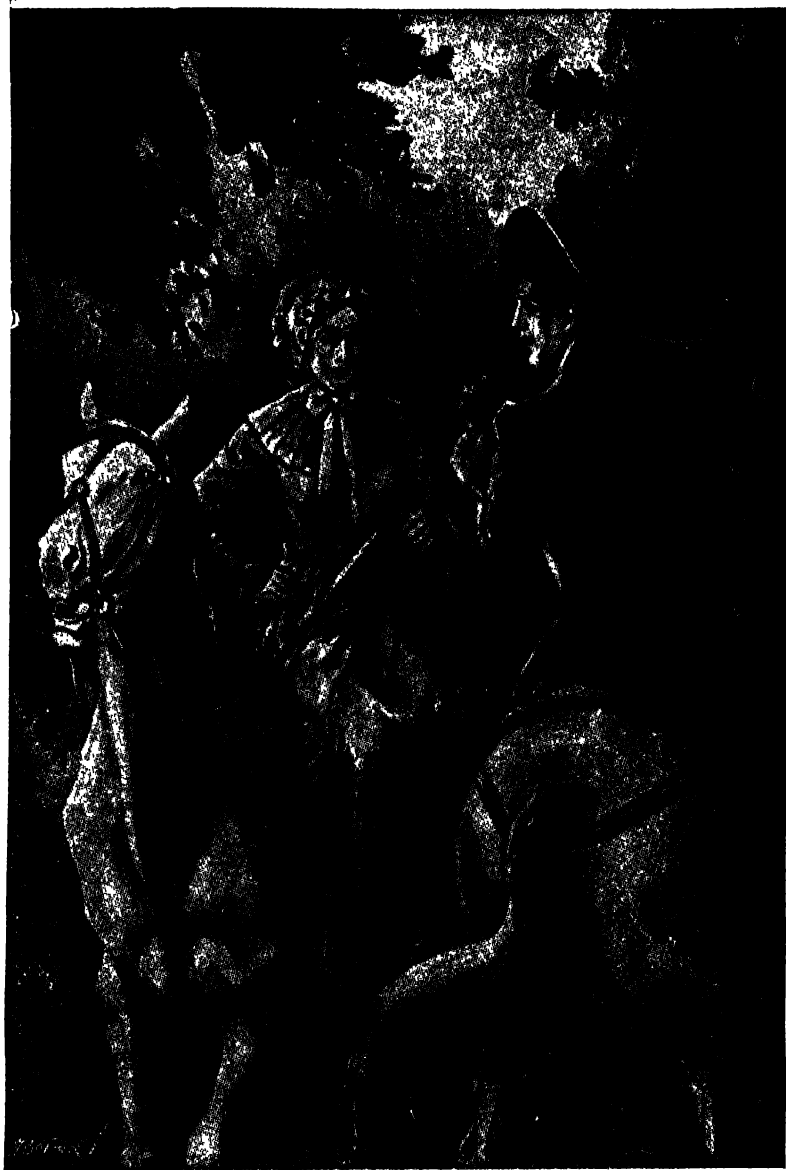
"ডায়না কাঁদছে! কাঁদতে কাঁদতেই ফিসফিস করে বলল ফ্র্যাংক! বিদায়—চির বিদায়!"

পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? স্পষ্ট শুনেছি, একা একা কথা কইছেন ঘরের ভিতরে।"

এদিকে সিড্‌ল এসে পড়েছে। সে ফ্রাঙ্ককে বলল—"সার ফ্রেডারিকের কোন বিপদ আপনি ঘটতে দেবেন না, তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুরু যে লোক দুটোকে এনে বাড়িতে ঢুকিয়েছে, তার অন্তত একটা যে জবসনের চর, এ আমি ভাল ভাবেই জানি। দেখুন, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

ফ্রাঙ্ক খুব ভাবনায় পড়ল, কিন্তু ভেবে তো কূলকিনারা পাওয়া যায় না! সার ফ্রেডারিক আর ডায়না সেই ঘরে চলে গিয়েছেন, যেখানে ডায়না আগেও থাকত। তাঁকে আর এত রাত্রে বিরক্ত না করে সে একা একা শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল, ফ্রাঙ্কের তা খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরের দরজায় ভয়ানক শোরগোল আর হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। সদর গেটে প্রচণ্ড ধাক্কা, আর বহুলোকের তম্বি—"দোর খোলো দোর খোলো" বলে।

ফ্রাঙ্ক ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিছানা থেকে। নীচে থেকে শোনা যায় র‍্যাশলির কথা—"রাজার নামে বলছি, দোর খোল। এখানে রাজদ্রোহী লুকিয়ে আছে, খবর পেয়েছি আমরা।"

দরজা যাতে না খোলা হয়, সেজন্যে ফ্রাঙ্ক ছুটে নামতে যাবে নীচে, এমন সময়ে হতভাগা এগুরু আর এক দফা বিপদ বাধিয়ে বসল। সে তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে দিয়ে এই বলে সাধু সাজল যে—"রাজার নামে যে কেউ ঢুকতে পারে এখানে। তবে আমরা রাজভক্ত লোক, রাজদ্রোহী এখানে লুকিয়ে থাকতে পারেই না।"

ফ্রাঙ্ক দেখল, যা সর্বনাশ করবার, এগুরু হতভাগাটা তা করেই বসেছে। এখন আর নীচে নামা বৃথা। তার চেয়ে ডায়নাকে আর সার ফ্রেডারিককে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে তাঁদের ঘরের দিকেই যাওয়া উচিত। পালাবার কোন পথ আছে কিনা, তা ফ্রাঙ্কের চাইতে তাঁরাই ভাল জানেন।

লাইব্রেরি ঘরে ফিরে আসতেই দেখে—ডায়না তার বাবার সঙ্গে ইতিমধ্যেই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ডায়না বলল—"তুমি ভয় পেয়ো না। বাগানের ভিতর দিয়ে আমরা সহজেই পালাতে পারব। কিন্তু কী করে খবর পেল ওরা ?"

ফ্রাঙ্ক গভীর হতাশায় বলল—"ওই এগুরু! ও নিশ্চয় ওর বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলেছিল যে আমায় কথা বলতে শুনেছে ঘরের

ভিতর। সিড্‌ল তো বলে—ওই লোকগুলো জবসনের চর—”

সার ফ্রেডারিক বাগানের দিকে বেরিয়ে পড়েছেন ডায়নার সঙ্গে, ইতিমধ্যে জবসন উপরে উঠে এল কনস্টেবল নিয়ে। সঙ্গে এগুরুর সেই বন্ধুরাও আছে। তারা এসে সব ঘর খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ফ্রাঙ্ক ভাবে—যতক্ষণ এরা এখানে খুঁজবে, ডায়নারা ততক্ষণই সময় পাবে পালিয়ে যাবার। জবসনের যাতে দেরি হয়, তার চেষ্টাই সে বিধিমতে করতে লাগল।

কিন্তু জবসনের চাইতেও মাথাওয়ালা লোক সার ফ্রেডারিকের পিছনে লেগেছে। সে র‍্যাশলি। জবসনকে উপরে পাঠিয়ে সে লোকজন নিয়ে আগলে আছে বাগানের পথ। পলাতকদের সে সহজেই ধরে ফেলল, এবং বন্দী করে নিয়ে এল লাইব্রেরি ঘরে। ফ্রাঙ্ককেও বন্দী করতে সে বাকী রাখল না। ফ্রাঙ্কের অপরাধ, জেনে শুনে সে রাজদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে। এটাও একরকমের রাজদ্রোহ।

র‍্যাশলির আনন্দ আজ দেখে কে! সে রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠেছে। সার ফ্রেডারিক তার হাত থেকে লক্ষ পাউণ্ড কেড়ে নিয়ে ফ্রাঙ্ককে দিয়েছিলেন। এইবারে এক অস্ত্রে সে সার ফ্রেডারিক আর ফ্রাঙ্ক—দুইজনকেই নিপাত করবে। তারপর অসওয়ালডিস্টোন দখল করে, জোর করেই ডায়নাকে বিয়ে করবে।

বিদ্রোহীদের জেলখানায় নিয়ে যাবার জন্যে সে সার হিল-ডিব্রাণ্ডের বড় ঘোড়ার গাড়িটা বার করতে বলল। সে নিজে লোকজন নিয়ে পাহারা দিতে দিতে ওদের নিয়ে যাবে শহরে।

কিন্তু এগুরু কোথায় গেল এ সময়ে?

য পলায়তে, স জীবতি। জবসন উপরে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সদর দিয়ে পালিয়েছে। ব্যাপার ঘোরালো, ফ্রাঙ্ক যখন ধরা পড়েছে, তার ভৃত্যকেও ওরা ছেড়ে দেবে না। এসময়ে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

সে পালাল সদর দিয়ে। ওদিকে বিস্তীর্ণ বনভূমি, বাড়িরই সংলগ্ন। সেই বনের এক কোণ দিয়ে সে ছুটছে, হঠাৎ অন্ধকারে টক্কর লেগে গেল একটা গরুর সঙ্গে। গরুটা শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। গরু একটাই নয়, অনেক। আর শুধু গরুও নয়, গরুর পাশে পাশে মানুষও। একজন এসে এগুরুকে ধরল—“এত রাত্রে তুমি ছুটছ কোথায়? হল কী?”

“তোমরা কে?” পাল্টা প্রশ্ন এগুরুর।

"দেখছ না, আমরা পশু কেনাবেচার ব্যবসায়ী? ক্যাম্পবেল সাহেবের পশু এসব। হাইল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হবে।"

একজন লোক উঠে এল একটা গরুর পাশ থেকে—"কে, এগুরু নয়? ফ্রাঙ্কের চাকর? তুমি ছুটছ কেন? ফ্রাঙ্ক কোথায়?"

"কে? ম্যাক্‌গ্রেগর সর্দার না? আর ফ্রাঙ্ক! সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্দার!" এই বলে এগুরু সব কথা খুলে বলল। ফ্রাঙ্ক, সার ফ্রেডারিক, ডায়না সবাইকে যে র‍্যাশলি আর জবসন গ্রেফতার করেছে, তা শুনে সর্দার রাগে ফুলতে লাগলেন। সার ফ্রেডারিককে নিয়ে যাবার জন্যেই যে তিনি এসেছিলেন!

তাঁর আদেশে তৎক্ষণাৎ সবগুলো গরুকে এনে সদর গেটের সম্মুখে শুইয়ে দেওয়া হল। বনের ভিতরে কাটা গাছও পড়ে ছিল দু-চারটে, সেগুলোও টেনে এনে ফেলা হল সেইখানে।

আওয়াজ পাওয়া গেল—গড়গড় করে সার হিলডিব্রাণ্ডের বড় গাড়িটা আসছে। সঙ্গে সঙ্গেই পশুরক্ষকেরা সব লুকিয়ে পড়ল আশেপাশে। সেখানে শুয়ে রইল কেবল গরুগুলো আর পড়ে রইল কয়েকটা লম্বা গাছ, পথের উপর আড়াআড়ি ভাবে।

গাড়ি সোজা বেরিয়ে এল। গাড়ির দরজা বন্ধ, তার চারদিকে ঘোড়ার পিঠে র‍্যাশলি, জবসন আর তাদের লোকজনেরা।

গেটের কাছে এসে শেষ পর্যন্ত গাড়ি থামাতেই হল। গরুগুলোকে তাড়া দিতে তারা উঠে পালাতে লাগল বটে, কিন্তু গাছগুলো তো আর নিজে থেকে পালাবে না! র‍্যাশলির মনে হল—মালিক নেই বলে বাইরের লোক এসে বাগানের গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে, তারাই এই গুঁড়িগুলো ফেলে গিয়ে থাকবে। রাগে গজগজ করে সে ঘোড়া থেকে নেমে এল, আর লোকজন দিয়ে গাছ সরাতে লাগল রাস্তা থেকে।

আর তক্ষুনি হৈহৈ করে তাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল ম্যাক্‌গ্রে-গরের হাইল্যাণ্ডারেরা। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে র‍্যাশলি ছাড়া সবাই নিরীহভাবেই ধরা দিল, কারণ তারা কেউই যোদ্ধা নয়। পাহাড়িরা বেঁধে ফেলল তাদের।

কিন্তু র‍্যাশলি তরোয়াল খুলে রুখে দাঁড়িয়েছে, গাড়ির দরজার কাছে সে কাউকে এগুতে দেবে না।

তার সম্মুখীন হলেন রব রয়, অর্থাৎ ম্যাক্‌গ্রেগর সর্দার। তাঁর হাতেও খোলা তরোয়াল, তাঁর চোখেও আজ ক্রোধের জ্বালা।

"তুমি একটা নারকী। তোমার উচিত দণ্ড দেবার জন্যে আমি অনেক দিন থেকে সুযোগ খুঁজছি। এস, লড়াই কর!" এই বলে

সর্দার আক্রমণ করলেন তাকে। র‍্যাশলি সুদক্ষ তরোয়ালবাজ, কিন্তু ম্যাক্‌গ্রেগরের সঙ্গে সে এঁটে উঠবে কেমন করে ? দুই মিনিটের ভিতরই সে ভয়ানক আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তখন গাড়ির দরজা খুলে ফেললেন ম্যাক্‌গ্রেগর, নামিয়ে আনলেন সার ফ্রাডারিক আর ডায়নাকে। ফ্রাঙ্কও নেমে এল। এসে বলল—"আবারও তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ সর্দার। যখনই বিপদে পড়ি, তখনই তুমি এসে উদয় হও, সাহায্য করবার জন্যে। কেমন করে তুমি জানতে পার ?"

একটু হেসে সর্দার জবাব দিলেন—"জানতে পারার ব্যাপার তো নয়! আমি যে কর্তাকেই খুঁজতে এসেছি!"

সার ফ্রেডারিককে কর্তা বলে সব রাজদ্রোহীরা, তা এখন জেনেছে ফ্রাঙ্ক।

"এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ম্যাক্‌গ্রেগর?" জানতে চান ফ্রেডারিক।

"উত্তর উপকূলে। সেখান থেকে কোন রকমে আপনাদের রওনা করতে পারব বোধ হয়। আর দেরি করবেন না, চলুন।"

র‍্যাশলিদের ঘোড়াগুলো নিয়েই সার ফ্রেডারিক, ডায়না আর ম্যাক্‌গ্রেগর রওনা হলেন। হাইল্যাণ্ডারেরা গরু তাড়াতে তাড়াতে চলে গেল পাহাড়ের পথে।

ম্যাক্‌গ্রেগর বলে গেলেন ফ্রাঙ্ককে—"আপনার কোন বিপদের ভয় নেই। যাঁদের ভয় আছে, তাদের আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এক্ষুনি লণ্ডনে ফিরে যান। নইলে র‍্যাশলি বেঁচে উঠতে পারে, জবসন তো বেঁচে আছেই, ওরা হয়ত আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।"

ডায়না চুপি চুপি শুধু একটি কথা বলারই সুযোগ পেল ফ্রাঙ্কের কানে কানে—"এবার সত্যি সত্যিই বিদায়—চিরদিনের জন্য।" কান্নায় বুঝি তার গলা বুজে এল।

ফ্রাঙ্ক একটি কথাও বলতে পারল না।

তার হাতেও অনেক কাজ। বাঁধা লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে, র‍্যাশলির শুশ্রূষা করতে হবে। জবসনকে ডেকে সে বলল—"তুমি তো লক্ষ্য করেছ—লড়াইয়ের সময় আমি গাড়িতেই বসে ছিলাম, আমি লড়াইয়ে কোন অংশ নিইনি। আশা করি, সময় কালে তুমি সত্যি কথাই বলবে—অকারণে আমাকে এর মধ্যে জড়াবে না। এখন র‍্যাশলিকে গাড়িতে তুলে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে, তুমি গাড়িতে ওর পাশে বসো।"

র‍্যাশলি এবং আরও কয়েকজন আহত লোককে গাড়িতে তোলা হল ; জবসনও উঠল গাড়িতে। গাড়ি চালানো হল প্রাসাদের দিকে।

কিন্তু প্রাসাদে নিয়ে নামানোর পরেই দেখা গেল যে র‍্যাশলির জীবনের আর আশা নেই। চিকিৎসক আনবার সময়ও নেই ; জবসন ফ্রাঙ্ক সিড্‌ল—এরাই ব্যাণ্ডেজ বাঁধার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বাধা দিল র‍্যাশলিই—"আমার আর বেশীক্ষণ বাকী নেই। শুধু শুধু বিরক্ত করো না আমাকে।"

একটু পরেই র‍্যাশলি মারা গেল।

আট

এরপর দুই বৎসর কেটে গিয়েছে।

ফ্রাঙ্ক এখন অসওয়ালডিস্টোন কোম্পানিতে তার বাবার ডান হাত ; কবিতা লেখার অভ্যাস তার এখনও যায়নি। কিন্তু তার দরুন ব্যবসাকর্মে তার অমনোযোগও দেখা যায় না। আওয়েন তো বলেন—"ফ্রানসিস্ সাহেবের বিষয়বুদ্ধি তাঁর বাবার চাইতে কম নয়।"

অবশ্য ফ্রাঙ্ক একথা শুনলেই বলে—"আপনার ও শুধু পক্ষপাতের কথা।"

মাঝে মাঝে কোম্পানির কাজে ছুটি নিয়ে সে জমিদারিতে আসতে বাধ্য হয়। অসওয়ালডিস্টোনদের জমিদারি আর প্রাসাদের উপর তার অধিকার এখন সবাই স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রাসাদে এসে ফ্রাঙ্ক কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারে না। লাইব্রেরিতে ঢুকলেই তার প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে। ডায়নাকে সে কোনমতেই ভুলতে পারে না। ভুলতে সে চায়ও না। তার জীবনে আর অন্য নারীর স্থান হবে না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

ডায়নার সম্বন্ধে এইটুকুই সে শেষ খবর পেয়েছিল যে সার ফ্রেডারিক তাকে নিয়ে নিরাপদে ফরাসী দেশে পৌঁছেছেন। তারপর আর কোন সংবাদ নেই।

ম্যাক্‌গ্রেগরের সঙ্গে যোগাযোগও সে আর রাখতে পারেনি। অওয়ালডিস্টোন হলে যখন যায়, তখনও কারও মুখে ম্যাক্‌গ্রেগরের নাম সে শুনতে পায় না আর। পাহাড় থেকে আর তিনি নামেন না।

এইভাবে দুই বৎসর কেটে গিয়েছে।

আজ ফ্রাঙ্ক লণ্ডন থেকে এসেছে জমিদারিতে। সারাদিন কাটিয়েছে ইঙ্গলউডের বাড়িতে। এখন আবার ইঙ্গলউডই শান্তিরক্ষক হয়েছেন এ অঞ্চলের। অর্থাৎ জাস্টিস। স্ট্যাণ্ডিসের মৃত্যু হয়েছে, দেশও শান্ত এখন। ক্যাথলিক প্রোটেস্টাণ্টের কলহও এখন ঢিমিয়ে পড়েছে। কাজেই আবার তাঁর আগের পদগ্রহণ করতে ইঙ্গলউড আপত্তি করেননি।

জবসন আবার ফিরে এসেছে ইঙ্গলউডের কাছে। সেও বদলে গিয়েছে খুব। ফ্রাঙ্ককে দেখলে এখন সে বিনীতভাবে হেসে টুপি খুলে সম্মান জানায়।

সারাদিন ইঙ্গলউডের বাড়িতে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় সে প্রাসাদে ফিরেছে, এণ্ডরু এসে খবর দিল—"চিঠি আছে একখানা, চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে লাইব্রেরি ঘরে।"

"চিঠি? লণ্ডনের?" প্রশ্ন করে ফ্রাঙ্ক অবাক্ হয়ে—"চিঠি কেন আসবে লণ্ডন থেকে? আমি তো সবে আজই আসছি!"

লাইব্রেরিতে গিয়ে সে টেবিলের উপর চিঠি দেখতে পেল বটে একটা।

না, চিঠি লণ্ডনের নয়। চিঠি ফ্রান্স থেকে এসেছে। লিখেছেন সার ফ্রেডারিক ভারনন। চিঠিটা পড়তে পড়তে ফ্রাঙ্কের বুক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার। সার ফ্রেডারিক লিখেছেন—

"বৎস ফ্রাঙ্ক, আমি মৃত্যুশয্যায়। ফ্রান্সে পৌঁছেই আমি ডায়নাকে এক মঠে ভরতি করে দিয়েছিলাম সন্ন্যাসিনী জীবনের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলবার জন্যে। এতদিন সেই মঠে বসে সে সংযম অভ্যাস করেছে। আমি তাকে সেই থেকে আর দেখিনি।

মরতে বসে সব খ্রীষ্টান যা করে, আমিও তাই করেছি। আমার পাদরির কাছে অকপটে জীবনের সব কথা খুলে বলেছি। ডায়নার কথাও কিছুই গোপন করিনি।

পাদরি আমার হিতৈষী বন্ধুও বটে। তিনি সব শুনে আমায় উপদেশ দিয়েছেন—ডায়নার সম্বন্ধে ব্যবস্থাটা বদলাবার জন্যে, অবশ্য যদি ডায়নার তাতে আপত্তি না হয়।

ডায়নার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করলে ভাল হবে, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি কোন পরামর্শ দিতে পার? তুমি তার হিতৈষী ছিলে, তাই তোমাকে লিখছি। আরও একজন হিতৈষী তার আছে, রব রয় ম্যাক্‌গ্রেগর। তাকেও আমি লিখলাম। তোমাদের দুজনের মত পেলে ডায়না সম্বন্ধে যা হয় ঠিক করব। অবশ্য যদি

ইতিমধ্যে ভগবান আমাকে ডেকে না নেন। যদি নেন, তাহলে তোমরা দুজনে পরামর্শ করে যা স্থির করবে, তাতেই আমার আত্মা তৃপ্ত হবে জেনো। ফ্রেডারিক ভারনন

পুনশ্চ—পাদরি বলেছেন, ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টাণ্টের মধ্যে কোন পার্থক্য ভগবানের চোখে নেই। হায়, একথা আগে কেউ আমাকে বলেনি কেন ?"

এইখানেই চিঠির শেষ।

চিঠি পড়বার পর ফ্রাঙ্ক পাথরের মূর্তির মত বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। বাইরে স্তব্ধ, কিন্তু বুকের ভিতর একটা অসহ্য তোলপাড়।

ক্যাথলিকে প্রোটেস্টাণ্টে কোনও পার্থক্য নেই !—এটা কিসের ইঙ্গিত ?

চিঠিখানা বার বার পড়ছে, কখনও আবার অন্যমনে উলটে-পালটে দেখছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল। চমকে উঠে চিঠির নীচেকার তারিখটা লক্ষ্য করল। এ কী ! চিঠি যে প্রায় তিন মাস আগের লেখা !

এত দেরি হল চিঠি আসতে ? এতদিন সার ফ্রেডারিক কি বেঁচে আছেন ? এতদিন কি ডায়না তার মঠে আগের অবস্থাতেই আছে ? না, ফ্রাঙ্কের দিক্ থেকে সাড়া না পেয়ে সে হতাশ হয়ে চিরজীবনের মত সন্ন্যাসই বরণ করেছে ?

কেন এত দেরি হল চিঠি আসতে ?

এগুরুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল ফ্রাঙ্ক—"কে এনেছিল এ চিঠি ?"

"এক সন্ন্যাসী। ফরাসী দেশ থেকে দুটো চিঠি এনেছিলেন। একটা পৌঁছে দিয়ে এখানে আসবার পথে গ্লাসগোতে ব্যারামে পড়েন। প্রায় আড়াই মাস অসুস্থ থাকবার পর, আজ এখানে চিঠি পৌঁছে দিয়েই ইয়র্ক শহরে চলে গেলেন সেণ্ট মদলিনের সমাধি দেখবার জন্যে।"

আড়াই মাস অসুস্থ ছিলেন পত্রবাহক। সুতরাং এত দেরি ফ্রাঙ্কের চিঠি পৌঁছাতে। কৈফিয়ত পাকা। দোষ ধরার উপায় নেই। কিন্তু দোষ কারও না থাকলেও ওদিকে বোধ হয় সর্বনাশ হয়ে গেল। ফ্রাঙ্কের সর্বনাশ ! সর্বনাশ ডায়নারও। যে ফ্রাঙ্ককে ভালবাসে, ফ্রাঙ্কের ভালবাসার আশা না পেয়ে সে হয়ত এমন কাজ করে বসেছে, যা থেকে আর পিছিয়ে আসবার উপায় নেই।

দুঃখে নৈরাশ্যে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল ফ্রাঙ্ক।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"এত অস্থির হয়েছেন কেন মিস্টার ফ্রানসিস্ ?"

"ম্যাক্‌গ্রেগর ?" লাফিয়ে উঠে ফ্রাঙ্ক পুরোনো বন্ধুর দু'হাত জড়িয়ে ধরল। পিছনের দরজা দিয়ে ম্যাক্‌গ্রেগর এসেছেন, বাগানের পথে।

"অস্থির ? অস্থির হয়েছি কেন ?" নিঃশব্দে চিঠিখানা তুলে ম্যাক্‌গ্রেগরের হাতে দেয় ফ্রাঙ্ক, তারপর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে —"সবে আজ এল ! এইমাত্র !"

চিঠিটা পড়লেন ম্যাক্‌গ্রেগর, বললেন—"তাই আপনি যাননি, নাকি ?"

"তাতেও সন্দেহ করছেন নাকি ?" বেশ রাগতভাবেই ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞাসা করে।

"ডায়না সন্দেহ করেছিল।"

"করেছিল ? ডায়না সন্দেহ করেছিল ?" কথা বলতে গিয়ে স্বর ভেঙে যায় ফ্রাঙ্কের।

"না করে আর করে কি ? সার ফ্রেডারিক দুইজনকে চিঠি লিখেছিলেন। যার মতামতের দাম কোন নেই, সে গিয়ে সশরীরে হাজির হল, অথচ যার উপরে সব জিনিসটাই নির্ভর করছে সে না গেল নিজে, না দিল চিঠির জবাব। এ অবস্থায় ডায়না কি ভাববে না যে সে ক্যাথলিক মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নয়, ক্ষণিকের মোহ যেটা তার মনে এসেছিল, তা সে ভুলে যেতে পেরেছে ?"

"ডায়না এই ভাবল ? ডায়না এই কথা বিশ্বাস করল যে আমি অবিশ্বাসী ? এর পরে আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই।"

এই বলে ফ্রাঙ্ক একখানা চেয়ারে বসে পড়ে টেবিলের উপর মাথা রাখল। বুক ভেঙে কান্না আসছিল তার, তারই তাড়নায় সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

আর তক্ষুনি তার মাথার উপরে নেমে এল একখানা হাত। বড় কোমল, বড়ই যেন স্নিগ্ধ। ম্যাক্‌গ্রেগরের স্পর্শ কি এত মধুর ? অত দুঃখের মধ্যেও কৌতূহলে মাথা তুলতে হল ফ্রাঙ্ককে।

পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাক্‌গ্রেগর নয়, পাশে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ডায়না।

ডায়না বলছে—"ওই কথাই হয়তো আমি ভাবতাম, ওই সর্বনেশে ভুল কথাই হয়ত আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতাম—যদি না ম্যাক্‌গ্রেগর আমাকে বোঝাতেন যে এ হতে পারে না, যদি না তিনি জননী মেরীর নামে শপথ করে বলতেন যে ফ্রাঙ্ক কখনও ডায়নার প্রতি উদাসীন হতে পারে না, পারে না।"

শেষ